রসে টুইটম্বুর—

রঙীন মনের মানুষ

সৈয়দ মুজতবা আলীর

হাতে—

দোল-পূর্ণিমা

১৩৬৬

প্রীতিকামী

স্বপনবুড়ো

ষাট বছর বয়েস হতে চলো কিন্তু অফিসের প্রাচীন বেয়ারা সর্ব্বেশ্বরের 'ছোকরা' নামটা এখনো ঘুচল না। সেই জন্যে ওর নাতির বয়েসী নতুন কর্ম্মচারীরাও ওর বাপ-মায়ের দেয়া নামে না ডেকে 'ছোকরা' বলেই অভিহিত করে থাকে।

হয়ত এতে সবাই আনন্দই পায়!

সর্ব্বেশ্বর যখন সর্ব্বপ্রথম এই অফিসে চাকরি নিয়ে আসে তখন তার বয়েস ছিল বছর পনেরো। সেই সময়কার ছোট সাহেব তাকে 'ছোকরা' বলে ডাকতে শুরু করে। সেই ছোকরা নামটা আস্তে আস্তে সারা অফিসে চালু হয়ে যায়। সর্ব্বেশ্বর নামটা উচ্চারণ করা ছোট সাহেবের পক্ষে একটু শক্ত ছিল। আর ছোকরা নামটা ডাকাডাকির পক্ষে বিশেষ সুবিধেজনক। কাজেই, এই নিয়ে আর কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় নি। যার নাম সেও নয়—আর যারা ডাকে তারা তো নয়ই।

সর্ব্বেশ্বরের একটা মস্ত বড় গুণ এই যে, অফিসের বাবুদের সুখ-সুবিধার দিকে তার চিরকালই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। কে অফিসের নিচেকার পান-ওয়ালীর হাতের তৈরী পান খায় না—সর্ব্বেশ্বর তার জন্যে নিজের বাড়ী থেকে আলাদা করে পান সেজে নিয়ে আসে। কোন্ নতুন বাবু আদৌ পান মুখে দেয় না—সর্ব্বেশ্বরের বটুয়াতে তার জন্যে ভাজা মশলা আলাদা করে রাখা আছে। ছোকরা বলে হাঁক দিলেই একটু একটু করে দিয়ে যায়। অফিসের বাবুরা ঘড়ি-ঘড়ি চা খায়। সর্ব্বেশ্বর নিজে হাতে সব তৈরী করে দেয়। এ জন্যে অফিসের আলাদা একটি কোণ কাঠ দিয়ে আর পর্দ্দা ঝুলিয়ে ঘেরাও করা আছে। লাইট-চা কড়া-চা কার কি

প্রীতিপ্রদ সব সর্ব্বেশ্বরের কণ্ঠস্থ। সারাদিন ধরে বিভিন্ন ধরণের চা তৈরী করে ছোকরা পরিবেষণ করে থাকে। তাতে নাকি অফিসের বাবুরা কাজে বিশেষ প্রেরণা পায়।

অফিসের বাবুরা নিজেদের মধ্যে আরো একটি ব্যবস্থা করেছে। সেটা হচ্ছে মাথা পিছু একটা মাসিক চাঁদা ধার্য্য করে সংগ্রহের ভার দিয়েছে সর্ব্বেশ্বরের ওপর। প্রতিদিন দুপুর বেলা তাই থেকে টিফিন তৈরী করে খাওয়ায় সর্ব্বেশ্বর। অন্যান্য বেয়ারা থেকে সর্ব্বেশ্বরের আভিজাত্য তাই আলাদা। ওর মুন্সীয়ানারও বাহাদুরি দিতে হয়। খুব অল্প খরচে সবাইকে সে নিত্য নতুন খাবার তৈরী করে খাওয়ায়। কে ঝাল, কে নোন্তা, কে মিষ্টি আর কে টক্ খেতে ভালোবাসে পাকা গিন্নীর মতো খুব কম ব্যয়ে দিনের পর দিন সে তার সুব্যবস্থা করে থাকে। তাই সর্ব্বেশ্বর একদিন অফিস কামাই করলে অফিসের বাবুরা চোখে আঁধার দেখে।

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নয় বটে—তবে সকলের দিকে তার সমদৃষ্টি। কার ফাইল পরিষ্কার করতে করতে অমানুষিক পরিশ্রমে মাথা ধরেছে—সর্ব্বেশ্বর ঠিক টের পেয়েছে। এমন চমৎকার করে কপাল আর ঘাড 'ম্যাসেজ' করে দেবে যে, মাথাধরা পালাতে পথ পাবে না। কার বাডী থেকে ছেলের অসুখের খবর এসেছে—সর্ব্বেশ্বর ছুটবে ওষুধ কিন্তে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে দিয়ে চিঠি লেখাবে—আরোগ্যসংবাদ জানতে। কোন্ বাবুর বাড়িতে বিয়ে বা শ্রাদ্ধ লেগেছে সর্ব্বেশ্বরের ওপর সমস্ত বাজার করার ভার দিয়ে গৃহকর্ত্তা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু অফিসে দুর্ম্মুখের অভাব নেই। তারা ঠারে-ঠোরে বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়! 'সর্ব্বেশ্বর সবাইকার মন জুগিয়ে বেশ কিছু টাকা-পয়সা করেছে। অফিসের অন্যান্য বেয়ারাদের নাকি সময় অসময়ে ধার দেয়—আর মোটা সুদ আদায় করে। সেই ধার পাওয়া থেকে মাঝে মাঝে অফিসের বাবুরাও বঞ্চিত হয় না। তবে তারা নাকি ধার নেয় গোপনে। মাইনে পাওয়ার দিন আবার তারা ঋণমুক্ত হয়।

মোট কথা সকল দিক দিয়ে সর্ব্বেশ্বর অফিসের বাবুদের এমন মায়ার-বাঁধনে বেঁধে রেখেছে যে, তার থেকে কোনো মতেই মুক্তি নেই!

যারা ওকে সত্যি ভালোবাসে তারা যুক্তি দেখায়—যে গরু দুধ দেয়—তার চাঁট্ সওয়া যায়।

এমনি ভাবে 'ছোকরা' সর্ব্বেশ্বর গোটা অফিসে একাধিপত্য স্থাপন করে বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করে চলেছে।

সামনে পুজোর ছুটি—সর্ব্বেশ্বর অফিসের বাবুদের আগে থেকেই বলে রেখেছে—এবার তার ভালো রকম বকশিশ চাই। ওর একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবে, তাই নতুন বৌয়ের জন্যে কিছু গয়না-গাটি করতে হবে।

দাবি বা আবদার কিছুমাত্র অন্যায় নয়। যে সারা বছর ধরে মায়ের স্নেহে আর গিন্নির আদরে ঘিরে রাখে সে যদি পুজোর সময় মোটা বকশিশ চায় তবে তাকে কোনো মতেই পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করা চলে না! অসময়ে অনেক করেছে সর্ব্বেশ্বর।

প্রাত্যহিক সেবার কথা ছেড়ে দিলেও—কারো অসুখের সময় রাত জেগেছে, কারো ফাই-ফরমাস খেটেছে, কারো উৎসব-আনন্দে বাজার করে দিয়েছে, কারো জন্যে বা সারা কলকাতা শহর আতি-পাঁতি করে দুষ্প্রাপ্য ওষুধ সংগ্রহ করে দিয়েছে। সত্যি, ওর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না!

অফিসের বাবুরা ঠিক করেছে, নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সর্ব্বেশ্বরের ছেলে-বৌয়ের জন্যে একটি মনোমত গয়না গড়িয়ে দেবে।

সে দিনটির কথা অফিসের বাবুদের বেশ মনে আছে। সকাল সকাল অফিসে এলো সর্ব্বেশ্বর। খুব হাসিখুশী। দিন কয়েকের ছুটি নিয়েছে সে। তাই ঠিক করেছে অফিস থেকেই একেবারে হাওড়া স্টেসনে রওনা হবে।

বেয়ারা থেকে বাবু পর্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে, ছেলের বিয়ের গল্প করছে—অপরের সুখ-দুঃখের কথা জানতে চাইছে।

যে কয়দিন সে ছুটিতে থাকবে সেই সময়টায় যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেদিকে সর্ব্বেশ্বরের সজাগ দৃষ্টি। একটি অল্প বয়েসী বেয়ারাকে পাখী-পড়া করে সব বুঝিয়ে দিয়েছে। চা, খাবার, পানের ভাণ্ডার হস্তান্তর করেছে নিতান্ত অপারগ হয়েই।

সকলের টেবিলের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে জানাচ্ছে, এই কটা দিন ক্ষমা-ঘেন্না করে কাটিয়ে দিন বাবু! আমি আবার ফিরে এসে আপনাদের সেবা করব। বাড়ি যাচ্ছি বটে, তবে আমার মন পড়ে থাকবে এইখানে।

সে কথা সর্ব্বেশ্বর মিথ্যা বলে নি।

অফিসের মায়া কাটানো সত্যি তার পক্ষে শক্ত।

তখন বেলা তিনটে।

সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি—সর্ব্বেশ্বরকে নিয়ে তাই শুরু হল।

যে মানুষটা চর্কির মতো সব সময়ে ঘুরে বেড়ায় সে হঠাৎ চুপচাপ একটা টুলের ওপর গিয়ে বসে রইল।

রতনবাবু ডাকলেন, ছোকরা, বাড়ীই তো চলে যাচ্ছিস্, তবে হাওড়া স্টেসনে রওনা হবার আগে খুব ভাল করে এক কাপ চা খাইয়ে যা—

আড়মোড়া ভেঙ্গে সর্ব্বেশ্বর বল্লে, আমি আর এখন উঠতে পারছি নে!

রতনবাবুর বয়স হযেছে—ওকে ভালও বাসেন খুব, তাই অবাক হয়ে সর্ব্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই তো, দিন পাঁচেক আগেই ওর ছেলের বৌয়ের গয়নার জন্য দশটাকার একখানি নোট ফেলে দিয়েছেন।

কি হল হঠাৎ সর্ব্বেশ্বরের! বাড়ি যাবে বলে কি একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল নাকি?

গোবর্দ্ধনবাবু 'লেজার' মেলাতে মেলাতে হাঁক দিলেন, ওরে ছোকরা, নীচের পানউলীর কাছ থেকে গুণ্ডি দিয়ে দু'খিলি পান সেজে নিয়ে আয় তো—শীগ্‌গির—

ছোকরা এমন একটা মুখ-চোখের ভাব দেখালে যেন সে কারো কথা শুনতে পায় নি!

গোবর্দ্ধনবাবু আবার ডেকে বল্লেন, ওরে সর্ব্বেশ্বর, যা-না বাবা—দু'খিলি পান এনে দে—

এইবার সর্ব্বেশ্বর হঠাৎ কেমন যেন চটে উঠে বল্লে, অত ওপর-নীচ বাবু আমি এখন করতে পারব না! দুদণ্ড একটু সুস্থির হয়ে বস্‌বার যো নেই!

গোবর্দ্ধনবাবু শুধোলেন, হ্যাঁ রে কি হল তোর ? সর্ব্বেশ্বর সে কথার কোনো জবাব দিলে না। হঠাৎ টুল থেকে উঠে পড়ে আলমারির কোণে, র‍্যাকের ধারে, কার্নিশের ওপর কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল।

বিরূপাক্ষবাবু একটা সিগারেটে টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে সর্ব্বেশ্বর, কিছু হারিয়েছে তোর ?

সর্ব্বেশ্বর চমকে উঠে উত্তর দিলে, না বাবু।

তবে কি হল সর্ব্বেশ্বরের ? ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করে অফিসের বাবুরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন।

বিপিনবাবু অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বল্লেন, অনেকদিনের পাতানো-সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বহু লোকের এই রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়।

ইন্দ্রনাথবাবু ফোড়ন কাটলেন, আবার অতি আনন্দেও অনেকের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পায়। আমাদের ছোকরা তার ছেলের বৌয়ের জন্যে গয়না গড়িয়ে স্ক্রু ঢিলে করে ফেলেনি তো ?

আড়ালে মুখ টিপে অনেকেই হাসতে লাগলেন। হিরণবাবু নতুন চাকুরে। সব সময় টিপ্‌টপ। এতক্ষণ ধরে ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন। এইবার পরীক্ষা করবার জন্যে হুমকি দিয়ে উঠে বল্লেন, ওহে ছোকরা, অমন চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। আগে আমার জন্যে এক প্যাকেট ক্যাপ্‌সটন সিগারেট নিয়ে আয়—

হঠাৎ যেন তপ্ত খোলায় কে তেল ছেড়ে দিয়েছে ! একেবারে জ্বলে উঠল সর্ব্বেশ্বর। চীৎকার করে বল্লে, আমায় খামোকা জ্বালাতন করবেন না বাবু!—গোটা অফিসের বাবুরা সর্ব্বেশ্বরের সেই হুম্‌কি শুনে একেবারে বোকা বনে গেল !

এ কি আশ্চর্য পরিবর্ত্তন সর্ব্বেশ্বরের ? কেউ বল্লে, বাড়ী যাবার ওর ইচ্ছে নেই —কেউ মন্তব্য করলে, ছুটিটা তাহলে নাকচ করে দিয়ে আয় সর্ব্বেশ্বর।

আর একজন রসিকতা করলে, বোধ করি ওর ছেলের বিয়ে ভেঙে গেছে··· তাই মন-মেজাজ ঠিক নেই !

এসব কোনো কথার দিকেই কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের কান নেই। সে শুধু উদাস দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে আলমারির কোণগুলি হাতড়ে হাতড়ে দেখছে।

এমন সময় অফিসের আর একজন বেয়ারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, কটায় তোমার ট্রেন? বাড়ী যাবে না সর্ব্বেশ্বরদা?

আর যাবে কোথায়! একেবারে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো সর্ব্বেশ্বর সেই বেয়ারাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ক্রমাগত কিল, ঘুষি, চড় মারতে মারতে মুখ বেঁকিয়ে বল্লে, বাড়ী যাবো না—আমার খুশী! তোর কিরে হারামজাদা? আর জিজ্ঞেস করবি কোনো কথা?

এই কাণ্ড দেখে ছুটে এলো অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বেয়ারার দল, জড় হল এসে অফিসের বাবুরা।

সর্ব্বেশ্বর কি অতি আনন্দে উন্মাদ হয়ে গেল নাকি? অনেক কষ্টে বেয়ারার দল ওকে ছাড়িয়ে নিলে, তারপর ওর টুলের ওপর ওকে দিলে বসিয়ে।

একজন বল্লে, মাথায় ওর রক্ত উঠেছে। বালতি বালতি জল মাথায় ঢালতে হবে।

চোখ পাকিয়ে, আস্তিন গুটিয়ে সর্ব্বেশ্বর হুঙ্কার দিয়ে উঠল, যে আমার মাথায় জল ঢালতে আসবে—তাকে আমি আজ খুন করে ফেলব।

এই অবস্থায় কি করা উচিত তাই নিয়ে সারা অফিসে গবেষণা শুরু হল।

অনন্তবাবু বল্লেন, কি কাজ এত ঝামেলায়? মেডিক্যাল কলেজে ফোন করে দি। ওরা এসে অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যাক। তারপর অফিসের খরচায় চিকিৎসা চলুক।

যে বেয়ারাটি মার খেয়েছিল—সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু ওকে ধরে গাড়ির ভেতর ঢোকাবে কে? আমি পারব না বাবু—

যার যে রকম খুশী মন্তব্য প্রকাশ করে চলেছিল—আর সর্ব্বেশ্বর তার টুলের ওপর বসে আপন মনে বিড়বিড় করছিল—এমন সময় বড়বাবুর ঘর থেকে ওর ডাক এলো।

অফিসের একজন বাবু বল্লেন, যেখানে বাঘের ভয়—সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। এখন বড়বাবুর ঘরে গিয়ে ও বেফাঁস কিছু যদি বলে বসে তবে ওর চাকরি আর থাকবে না!

এই কথা শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সর্ব্বেশ্বর।—হুঁ! চাকরি থাকবে না! দেখি, আমার চাকরি খায় কে? কার এমন বুকের পাটা?

বিপুল বিক্রমে টুল থেকে উঠে বড়বাবুর কামরার দিকে রওনা হল সর্ব্বেশ্বর।

যারা ওকে সত্যি ভালোবাসে তারা লোকটির আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করে একসঙ্গে ওকে ঘিরে দাঁড়ালো! কিছুতেই এই অবস্থায় বড়বাবুর ঘরে যেতে দেবে না।

কিন্তু সর্ব্বেশ্বরও ইতিমধ্যে একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছে। একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে যাক্—এই রকম ওর মনোভাব।

তাই কাউকে কিল, কাউকে ধাক্কা, কাউকে ঘুষি মেরে সে অবলীলাক্রমে নিজের রাস্তা পরিষ্কার করে নিল এবং তারপর সম্মুখ-সমরে এগিয়ে যাচ্ছে এই রকম একটা মুখভঙ্গী করে সদর্পে বড়বাবুর ঘরে ঢুকে পড়ল।

অফিস সুদ্ধু লোক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বড়বাবুর কামরায় কাঠের পার্টিশানের সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটা জায়গায় পার্টিশানটা ভাঙা ছিল! সৌভাগ্যক্রমে গোবর্দ্ধনবাবু সেই প্রার্থিত জায়গাটা পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চোখ দুটো বড় বড় করে দেখলেন, সর্ব্বেশ্বর টলতে টলতে বড়বাবুর সামনে গিয়ে হাজির হল। তারপর হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আমার চাকরি খাবেন নাকি বড়বাবু?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বড়বাবু এতটুকুও চটলেন না। বরং ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

হঠাৎ নিজের ড্রয়ার থেকে একটি টিনের কৌটো বের করে ফেল্লেন। খুলতেই দেখা গেল তার ভেতর কালো কালো গুলি।

বল্লেন, ব্যাটা, তোর মৌতাত ফুরিয়ে গেছে সে কথা তো আমি এখান থেকেই বুঝতে পারছি! বেলা তিনটে থেকে তুই চক্ষে আঁধার দেখছিস!

তেষ্টায় যার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—তার সামনে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল ধরলে সে যেমন পাগলের মত গেলাসটি তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে সবটা জল নিঃশেষ করে ফেলে—সর্ব্বেশ্বরও ঠিক তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা কয়েক গুলি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।

হয়তো বিষমই খেতে যাচ্ছিল। বড়বাবু তাঁর নিজের টেবিলের ওপরকার এক গেলাস ভর্ত্তি জল ওর দিকে এগিয়ে দিলেন।

এইবার মনে হল সর্ব্বেশ্বর প্রকৃতিস্থ হল। বড়বাবু হেসে আবার বল্লেন, ওরে বেটা মূর্খ, একথা তুই ভুলে গেলি কি করে যে, ত্রিশ বছর আগে তুইই আমায় এ জিনিসটি ধরিয়েছিলি! ফুরিয়ে গেলেই কিনে এনে দিতিস! আজ যখন হঠাৎ তোর ফুরিয়ে গেল—চুপি চুপি আমার কাছে এসে চাইবি তো!

এইবার সর্ব্বেশ্বর মাথা চুলকে একেবারে বিনয়ের অবতার হয়ে মুখখানি নীচু করে জবাব দিলে, আজ্ঞে, আপনি যে এখন বড়বাবু! আমাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা!

আমাদের বটুকেশ্বর রাতারাতি পাড়ার মাতব্বর হয়ে উঠল। কিছুদিন আগেও সে রোয়াকে বসে সকলের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা আর বাংলা-সিনেমা সম্পর্কে গলা ফাটিয়ে আলোচনা করত।

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করা গেল যে, বটুকেশ্বরের সদাউন্মুক্ত-দরজা রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং কপাটে একটি কাঠের ফলক বসেছে; তাতে লেখা রয়েছে—দেশ-কর্ম্মী বটুকেশ্বর বটব্যাল।

নেতা হতে গেলে যে সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মেশা চলে না—একথা বটুকেশ্বর হঠাৎ টের পেল কি করে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, কাশীধামে তার এক ধনী পিসি বাস করতেন, সম্প্রতি বিশ্বনাথের চরণে তিনি বিলীন হয়েছেন এবং এই অবসরে বটুকেশ্বরের হাতে অনেক অর্থ এসে পড়েছে। নদীর এপার ভাঙলে ওপারে চড়া পড়ে এ কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বটুকের জীবন যে তারই উদাহরণ স্বরূপ হয়ে উঠবে এ কথা আগে কে ভেবে রেখেছিল?

তবে এইটুকু আমরা বুঝতে পারলাম যে, বটুকের সঙ্গে এখন থেকে আর সরাসরি দেখা করা চলবে না; রোয়াকে বসে তেলে ভাজা আর গরম মুড়ি খেতে খেতে ফুটবল খেলার আলোচনা করতে তার ভদ্রতায় বাধবে এবং ওর সঙ্গে যদি একান্তই দেখা করতে হয় তবে সকলের আগে কার্ড ছাপিয়ে নিয়ে দারোয়ানের তাচ্ছিল্যের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে।

বটুকেশ্বর আর যাই হোক—সে যে বোকা নয়—এ কথা আমরা এক সপ্তাহের মধ্যেই জানতে পারলাম। নেতা হতে গেলে যে পাড়ার ছেলেদের হাত করতে হয়, এই গুহ্য তথ্য বটুকেশ্বর কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল বলা শক্ত, তবে

দেখা গেল, তার বাড়ীর ছাদে একটি বৈঠক আহ্বান করে পাড়ার যত নিষ্কর্ম্মা আর বেকার ছেলেদের সাদর আহ্বান জানিয়ে বটুকেশ্বর এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে বসল। সেই থেকে বেকার ছেলের পাল 'বটুকদার' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। বটুকদার মত নাকি লোক হয় না। এই পাড়ার উন্নতি যদি কেউ করতে পারে তো বটুকদাই করবে·· এই জাতীয় মন্তব্যে বিভিন্ন বাড়ীর রোয়াক মুখরিত হয়ে উঠল।

তারপরে এই বোঝা গেল যে, এখন থেকে বটুকেশ্বর নিজে রোয়াকে বসে আসর জমাবে না বটে, তবে সে ছেলেদের মধ্যে এক শ হয়ে বিরাজ করতে থাকবে। এ হলো আরো ভালো। নিজের প্রশংসা নিজে করা যায় না, কিন্তু ভোজের দৌলতে সবাই তার প্রচারের প্রতিযোগিতায় উঠে-পড়ে লাগল। আমাদের তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল ঃ

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"

কবি সত্যদ্রষ্টা ছিলেন নিশ্চয়ই। নইলে বটুকেশ্বর নিজে ঘরে আবদ্ধ থেকে পাড়াময় কি ভাবে ছড়িয়ে রইবে, এ কথা কবি এতদিন আগে জেনে লিখে গেছেন কী করে!

আমাদের অঞ্চলে একটা পোড়ো মাঠ ছিল। বটুকেশ্বরের উৎসাহ পেয়ে ছেলের দল রাতারাতি সেটাকে সাফ করে ফেল্ল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় চলত ছোকরাদের টেনিস আর ব্যাডমিনটন খেলা। কিন্তু কু-লোকে বলে থাকে—বটুকেশ্বরের সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের একটা গোপন প্যাক্ট হয়েছে যে, খেলার সমস্ত খরচ নেতা বটুকেশ্বর বহন করবে আর তার বদলে ঐখানে মাঝে মাঝে বিরাট জনসভা আহ্বান করা হবে এবং তার একমাত্র সভাপতি হবে—দেশকর্ম্মী বটুকেশ্বর বটব্যাল।

মসৃণ শুভ্র কার্ডে সোনার জলে ছাপা প্রথম সভার আমন্ত্রণ-লিপি যখন হস্তগত হল—তখন আমরা অনেকেই হকচকিয়ে গেলাম। বটুক আবার বক্তা হল কবে থেকে?

ছেলেরাই গোপনে খবর জানিয়ে দিলে, বটুকদা রোজ রাত্রে বড় আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা মক্স করে।

ভালো কথা।

সাধনা ছাড়া সিদ্ধি হয় না। কাজেই বটুকেশ্বরকে কোনো মতেই দোষ দেওয়া যায় না।

প্রথম সভায় জনসমাগম হল প্রচুর। মহিলাদের জন্যে বসবারও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলেরা আতর দান থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল। দেশপ্রেমের নমুনা দেখে আমরা সবাই পুলকিত হয়ে উঠলাম।

গরদের ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি-শোভিত বটুকেশ্বর শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে সভাস্থলে এসে হাজির হল। কাঁধের ওপর সাদা সিল্কের উড়নি মৃদু-মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত হচ্ছে···দেখে কে বলতে সাহস করবে যে, এই দেশকর্ম্মীই কয়েক দিন আগে আমাদের সঙ্গে রোয়াকে বসে তেলেভাজা, প্যাঁজ-ফুলুরী চিবোতো ?

আমরা বয়স্কের দল একদিকে স্থান করে নিলাম। পাড়ার যে মেয়েটির গান শেখার প্রচেষ্টায় কর্ণপটাহ-ভেদী চীৎকারে সবাইকার ঘুম ভেঙে যায়, তারই কণ্ঠ-নিঃসৃত উদ্বোধন-সঙ্গীতে সভার কার্য্য শুরু হল।

বিপুল করতালি-ধ্বনির সঙ্গে সভাপতির গলায় মাল্য অর্পণ করা হল এবং তৎপর শুরু হল উপস্থিত 'গণ্যমান্য জঘন্য' ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা।

আমাদের পাড়ায় যে এত বক্তার বাস তা আগে জানা ছিল না! গলা ফাটিয়ে কে কত চীৎকার করতে পারে এ যেন তারই একটা জোর পাল্লা চললো।

প্রত্যেকেরই বক্তব্য এক যে, এতদিনে পাড়ার একটি সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী খুঁজে পাওয়া গেল। বটুকেশ্বরবাবুকে আমরা কেউ চিনতাম না। এই ছাইচাপা আগুন পাড়ায় প্রকৃত হোমাগ্নিশিখার কাজ করবে।

অবশেষে উঠে দাঁড়ালো সভার সভাপতি স্বয়ং। তার দীর্ঘ বক্তৃতায় জানা গেল, এতদিন আমরা অন্ধকারে ঘুমিয়েছিলাম। এইবার আমাদের জাগবার শুভ-লগ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ঘুম ভাঙাবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছে—দেশকর্ম্মী বটুকেশ্বর বটব্যাল। জীয়ন-কাঠি নিয়ে সে পাড়ার রঙ্গভূমে আবির্ভূত হয়েছে। তার দৌলতে ছেলেরা যেমন একদিকে ক্লাব-ঘরে 'কীচক বধ' পালার মহলা দিতে

শুরু করেছে—তেমনি আর একদিকে চলেছে পাড়া-উন্নয়নী বিভিন্ন কর্ম্মপন্থা। এই অঞ্চলকে জঞ্জালমুক্ত করতে হবে, ইঁদুরের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করতে হবে, ছাদে ছাদে অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন চালু রাখতে হবে, খেলা-ধূলার দিকে সবিশেষ দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং সর্ব্বোপরি একটি বিতর্ক সভার সৃষ্টি করতে হবে। এই সময় পাড়ার একটি ইঁচড়ে পক্ক ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, তর্ক করতে আমরা সব সময়ই প্রস্তুত আছি বটুকদা, কিন্তু বেশী চ্যাঁচামেচি করলেই খিদে পায় যে!

মৃদু হেসে সভাপতি মন্তব্য করলে, আচ্ছা, তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না, বোস্…ক্ষিধের ওষুধের ব্যবস্থাও বিতর্ক-সভায় থাকবে।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সেদিন সভা ভঙ্গ হল। কিন্তু এই জয়ধ্বনিটা সভাপতির না, জ্যাঠা ছেলের প্রাপ্য, সেটা ঠিক ঠাহর করা গেল না।

এর পর থেকে ঘন ঘন সভা আহ্বান করা শুরু হল। সভায় বটুকেশ্বর বিবৃতি দিলে যে, সকলের আগে ছাদে ফসল ফলাবার আন্দোলনকে কার্য্যকরী করে তুলতে হবে। উৎসাহের প্রাবল্যে এ-কথাও জানিয়ে দেওয়া হল যে, স্বয়ং সভাপতিমশাই নিজের ছাদে ফসল ফলিয়ে দেখিয়ে দেবে কি ভাবে শহরাঞ্চলেও কৃষিকার্য অব্যাহত রাখা চলে!

বিবৃতির ফল অসম্ভব রকমে কার্য্যকারী হল। কেননা, পরদিন সকালবেলা দেখা গেল যে, বহুলোক বটুকেশ্বরের দরজার সামনে জমায়েৎ হয়ে শোরগোল করছে—আর ছাদে কি করে ফসল ফলাতে হয়, তারি কাজ হাতে-কলমে শিখতে চাইছে।

বাধ্য হয়ে বটব্যালকে তখনি হুকুম দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ছাদে এনে ফেলাতে হল। সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক খোল বাজিয়ে কীর্ত্তন শুরু করে দিলে—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না—
এমন মানব-জমিন্ রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

উৎসাহী বটুকেশ্বর সারা ছাদে তখন টমেটো, লঙ্কা আর উচ্ছের বিচি বুনে দিলে।

ছেলের দল জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, "জয় কলির জনক রাজা বটুকেশ্বর বটব্যাল।"

গোটা পাড়ায় সত্যিকারের একটা প্রেরণা জেগে উঠল।

পরবর্তী একটি সভায় অক্লান্ত কর্ম্মী বটুকেশ্বর ঘোষণা করলে—হয়তো আপনারা শুনে দুঃখিত হবেন যে, ফসল ফলানোর জন্য আমার ছাদে যে বিপুল আয়োজন করেছিলাম, সেখানে পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল জুটে ট্যাঙ্ক থেকে গঙ্গার জল ঢেলে পুতুল তৈরী করছে। ছোটদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে আমরা হচ্ছি কর্ম্মী। গীতার বাণী আমরা মেনে চলব। ফলের আশা না করে আমরা ক্রমাগত কাজ করে যাব।

একটু দম নিয়ে বটব্যাল মশাই বললে, এবার আমাদের অভিযান হবে—ইঁদুরের বিরুদ্ধে। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইঁদুরের জ্বালায় কলকাতায় বাস করা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বাড়ীর গৃহিণীরা বলতে পারেন, এই গণেশ-বাহনের দৌরাত্ম্যে তাঁদের অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার প্রায় শূন্য হতে বসেছে। বাড়ীর কর্ত্তারা ভুক্তভোগী যে, দামী বই আর আসবাবপত্র ইঁদুরবাহিনী ধ্বংস করতে বসেছে। ছোটরা সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, এই অনিষ্টকারী প্রাণী তাদের সাজানো 'খেলাঘর' তচ্‌নচ করে দিচ্ছে। কাজেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শত্রু এই ইঁদুরকুলকে নির্ম্মূল করতেই হবে। আপনারা সবাই হাত তুলে আমাকে সমর্থন করুন।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখা গেল—কেউ সভায় হাত তুলছে না, সবাই অধোবদনে বসে আছে।

তখন বটুকেশ্বর বটব্যাল বিপুল উদ্দীপনায় ঘোষণা করলে, আপনারা কেউ কর্ম্ম-বিমুখ হন, এটা আমি চাই নে। তাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি—প্রতি ইঁদুরের জন্য আমি চার আনা করে উপঢৌকন দেবো। যে যত খুশী পারেন জীবিত বা মৃত ইঁদুর ধরে নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। আমাদের শত্রুকে বাঁচবার আর কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

সমবেত হর্ষধ্বনির মধ্যে সভার কাজ সমাপ্ত হল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে বিরাট হট্টগোলে আরামের ঘুমটা ভেঙে গেল।

দোতলার জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি বটুকেশ্বরের বাড়ীর সামনে যেন একটা মেলা বসে গেছে। আমাদের অঞ্চলের নেতার বাড়ী থেকে আজ কি কোনো প্রভাতফেরী বেরুবে? এ রকম কোনো পরিকল্পনা ছিল বলে আগে তো শুনি নি! চোখ দুটো কচলে নিয়ে আবার তাকালাম। ভালো করে অবলোকনের পর আবিষ্কৃত হল যে, শুধু মানুষই নয়, প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে রাশি রাশি মরা ইঁদুর। কেউ খাঁচায় করে, কেউ কাগজে জড়িয়ে, কেউ বা র‍্যাশন ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে হাজির হয়েছে।

আমাদের বাংলাদেশে সত্যিকারের কর্ম্মীর অভাব এই কথাটা আজকাল অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাল সন্ধ্যার ঘোষণা আজ সকালে এমনভাবে কার্য্যকরী হয়েছে—তাকে বিস্ময়কর ব্যাপার বলতে হবে বৈ কি!

একটু বাদেই দেশকর্ম্মী বটুকেশ্বর বটব্যালের দর্শন পাওয়া গেল। নিজের ঘোষণায় অদ্ভুত ফল দেখে স্বয়ং নেতাও কম অবাক হয় নি! কিন্তু তার ভ্রূ-যুগল আরো কুঁচকে গেল যখন জানা গেল যে, মাথা-পিছু ইঁদুরের জন্যে চার আনা করে হিসেব করে তক্ষুণি সবাইকে টাকা মিটিয়ে দিতে হবে।

—আমার ক্যাশিয়ারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বলে বিরসবদনে নেতা অন্দরে চলে গেলেন।

সময় চলে যায়, কিন্তু টাকার থলি নিয়ে কেউ বাইরে আসে না দেখে জনতার কোলাহল ক্রমশ বেড়ে চল্লো।

শেষে বাধ্য হয়ে এক টেকো ভদ্রলোক সবাইকে উঠোনে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং একে একে টাকা-পরিশোধ করে বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলে।

কিন্তু সমস্ত হিসেব চুকিয়ে দেবার পর দেখা গেল যে, মরা ইঁদুরে গোটা উঠোন ভর্ত্তি হয়ে গেছে। জিনিসের দাম বুঝে নেবে অথচ মাল খদ্দেরকে দিয়ে যাবে না—এমন অকৃতজ্ঞ জনতার মধ্যে একজনও ছিল না। কাজেই হিসাব-নিকাশের পর সমস্ত মালই উঠোনে মজুত পাওয়া গেল। ততক্ষণে দোতলার ঘরে বটুকেশ্বরের সঙ্গে বটুকেশ্বর-গৃহিণীর তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে।

নাকে আঁচল গুঁজে বিনোদিনী বল্লে, তোমার দেশের কাজ নিয়ে তুমি থাকো,

আমি আজই বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছি।

বটুকেশ্বর বিস্মিত হয়ে জবাব দিলে, সে কী বিনোদিনী, তুমি দেশনেতার গৃহিণী, অনেক কণ্টক-পথ রক্তাক্তচরণে তোমায় অতিক্রম করতে হবে।

বিনোদিনী রসিকতা করে উত্তর দিলে, আলতা পরলেই আমাদের চরণ রক্তাক্ত হয়; তার জন্যে বেশী পরিশ্রম করবার দরকার নেই। কিন্তু তোমার এই পচা ইঁদুরের গন্ধ আমি সইতে পারব না।

কর্ত্তা-গিন্নীর কলহ দেখে চাকর গিয়েছিল একটা জমাদার ডাকতে। কিন্তু সেও ভগ্নদূতের মত এসে সংবাদ দিলে যে, কোনো জমাদারই পচা ইঁদুর পরিষ্কার করতে ঘাড় কাৎ করবে না।

সুতরাং আরো খানিক বাদে দেখা গেল, একটা বন্ধ ছ্যাকরা গাড়ী বটব্যালের বাড়ী হতে বহির্গত হয়ে গৃহিণীর বাপের বাড়ীর অভিমুখে ধাবমান হল!

কিন্তু সে সময় দেশনেতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একটি প্রাণীও এগিয়ে এলো না।

দেশনেতার এই বিরাট স্বার্থত্যাগ কি বিফলে যাবে? পুণ্যভূমি এই ভারত-ভূমিতে অতি প্রাচীনকাল থেকে বহু রাজপুত্র, জ্ঞানী, গুণী, তপস্বী কর্ম্মের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে পত্নী ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। কিন্তু দেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ পত্নী পতিকে ত্যাগ করেছে এই লোমহর্ষণ সংবাদ কি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে?

দেশনেতা বটুকেশ্বর বটব্যাল মনের দুঃখ মনে চেপে রুদ্ধকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করল:

"—ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ—"

ভবিষ্যৎ সমাজ তাকে একদিন পুরস্কৃত করবেই।

উত্তরকালে দেশ কি করবে এখন বলা শক্ত, তবে পাড়ার ছেলেরা যে তাকে ভোলে নি এ কথা অতি শীঘ্রই প্রমাণিত হল।

দেশনেতা বটুকেশ্বর বটব্যালের জন্মতিথি উৎসব পালিত হচ্ছে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে। পাড়ার ছেলেরা উদ্যোগী হয়েই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অবশ্য কু-লোকে রটনা করে থাকে, মাঠে যে বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরী হচ্ছে সমস্তই বটুকেশ্বরের টাকায়। গোটা পাড়ার দেওয়াল পোস্টারে ঢেকে গেল। প্রেসের দেনাও নাকি শোধ করবার ভার নিয়েছে বটব্যালের টেকো ক্যাশিয়ার।

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থায় এতটুকু ত্রুটি থাকে নি। যারা উক্ত সভায় যোগদান করবে প্রত্যেকে এক প্লেট করে মিষ্টি পাবে, এমন কাণা-ঘুষাও শোনা যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকদের মুখে-মুখে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্যে বটুকেশ্বর বিনোদিনীকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিল, কিন্তু সম্মতি-পত্র এখনো পাওয়া যায় নি।

জন্মতিথি উৎসবে লোকে লোকারণ্য।

প্রত্যেকের গলায় ঝুলিযে দেওয়া হচ্ছে ফুলের মালা, আর বিরাট তাঁবুর ভিতর প্রস্তুত হচ্ছে প্লেটভর্ত্তি খাবার। কাজেই উপস্থিত জনগণ দীর্ঘকাল ধরে হাসিমুখে বক্তৃতা শ্রবণ করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানাবে না।

গান, স্বস্তিবচন, আবৃত্তি, নৃত্য, কৌতুক, ম্যাজিক ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতার পর বটুকেশ্বরের উত্তর দেবার পালা।

বটুকেশ্বর জলদ-গম্ভীরস্বরে বল্লে, আমার দেশবাসী আমার জন্মদিনে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দিয়েছেন। কিন্তু আমি লেখক নই। তাঁরা যদি আমার জীবনের এই শুভদিনে পথ পরিষ্কারের সম্মার্জ্জনী তুলে দিতেন তবে আমি হৃষ্টচিত্তে পাড়ার আবর্জ্জনা মুক্ত করবার কাজে মুক্ত-মনে লেগে পড়তাম আর সেইটেই হত সত্যিকারের দেশের কার্জ।

সভাস্থ শ্রোতার দল ঘন-ঘন করতালি ধ্বনিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুললেন। উৎসাহী একটি ছেলে পাড়ার ধাঙ্গড় বস্তি থেকে রাস্তা সাফ্ করবার একটি ঝাঁটা এনে বটুকেশ্বরের হাতে তুলে দিল।

বটুকেশ্বর পশ্চাদপসরণের পাত্র নয়। শুভ্র মাল্য গলে সেই ঝাঁটা নিয়ে তক্ষুণি পথে নেমে রাস্তা পরিষ্কার করতে এগিয়ে গেল। শুধু তার পাশের এক চ্যালাকে

কানে কানে বল্লে, খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারকে জানিয়ে দাও যেন আমার রাস্তা ঝাঁট দেবার ছবিটা তুলে নেয়।

সমগ্র পল্লীর অধিবাসীকে সাক্ষী রেখে বটুকেশ্বর একটা গোটা রাস্তা ঝাঁট দিয়ে ময়লা মুক্ত করল।

জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠল। দেশনেতা সেই ঝাঁটা হস্তেই গৃহে ফিরে এলো। কে জানে এই ঝাঁটাই হয়তো একদিন লাখো টাকায় বিক্রী হয়ে জাতীয় যাদুঘরের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

গভীর রাত্রি।

গোটা পাড়া নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। প্রচুর খাবার খেয়ে কোনো বাড়ীতেই আজ রাত্রে উনুন জ্বালতে হয় নি। দেশকর্মীর প্রশংসায় আজ সবাই পঞ্চমুখ।

কিন্তু এই রাত্রে বটুকেশ্বরের চোখে ঘুম নেই কেন? সে নিজের ঘরে আলো জ্বালিয়ে চিঠি লিখছে ঃ

প্রাণাধিক বিনোদিনী,

নিবৃত্তির বিপাকে পড়ে আমি ক্রমশ পাঁকে জড়িয়ে যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় একটা রাস্তা ঝাঁট দিয়ে কোমরের ব্যথায় বিশেষ কাতর হয়ে পড়েছি। আজ রাত্রে কেবল তোমার কথাই মনে পড়ছে। দেশ-নেতা হতে গিয়ে তোমায় দূরে ঠেলে দিয়েছি।

আর নয়, আগামীকাল রাত্রের গাড়ীতেই কাউকে না জানিয়ে আমি তোমার উদ্দেশে রওনা হবো। জানি, তোমরা এখন সবাই মিলে মধুপুরে অবস্থান করছ। আশা করি তুমি এবার আমাকে তোমার পাশে ঠাঁই দেবে। আর একটি কথা, এর আগে লিখেছিলে, এখনো তোমার নাকে ইঁদুর পচা গন্ধ লেগে আছে। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব। "Evening in Paris" এক শিশি আমার কাছে আছে। ওটা গিয়েই শ্রীচরণে অর্পণ করব। ইতি—

হতভাগ্য

বটুকেশ্বর বটব্যাল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরের কাহিনী।

শ্যামবাজারের গলির মোড়ের এক ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে তিন বন্ধু হাফ-কাপ করে চা নিয়ে মৃদুস্বরে কথা-বার্ত্তা বলছিল।

সেই সকাল থেকে তারা তিনজনে এসে দোকানের একটি বেঞ্চ অধিকার করে বসেছে, আর ওঠবার নাম নেই! দোকানের মালিক তিন-চারবার বাঁকা এবং ক্রুদ্ধ চোখে ওদের দিকে তাকিয়েছে। অতীত ভারতে ভস্ম করবার কসরতটা অনেকেরই আওতার মধ্যে ছিল। কিন্তু ইদানীং গুরুমন্ত্র লোকে বেমালুম ভুলে গেছে! নইলে এতক্ষণ এই তিন ছোকরা কখন সিগারেটের ছাই হয়ে কলকাতার ফুটপাথে উড়ে বেড়াত।

হাফ-কাপ চা নিয়ে এতক্ষণ ধরে দোকানের জায়গা আটকে রাখলে দোকান-দারের সমূহ ক্ষতি। কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছু বলতেও পারে না। কেননা, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও এই তিন ছোকরার পরনে রয়েছে এ. আর. পির পোশাক! ওদের উঠতে বলে কি বিপদ ডেকে আনবে চায়ের দোকানের মালিক? হয়তো রাতারাতি ঘরই জ্বালিয়ে দেবে! কিম্বা বোমা!

তিন বন্ধুর প্রথম জনের নাম পটকা। সে যখন কথা বলে, মনে হয় শ্যামা-পূজোতে কেউ পটকা ছুঁড়ছে! দ্বিতীয় বন্ধুর নাদুস-নুদুস গোল-গাল চেহারা, আর দেহের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে একটু ধীর-স্থির! কথাও বলে গুনে-গুনে। এর নাম হচ্ছে জগদ্দল। জগদ্দল পাথরের মতই, একে নড়ানো শক্ত। একবার ভালো হয়ে চেপে বসলে একে ওঠায় কার সাধ্যি! তৃতীয় বন্ধুর নাম হচ্ছে লাটিম। দিন রাত কেবল কাজ আর অকাজ নিয়ে ব্যস্ত। আর সেই কাজ-

অকাজের গোলক ধাঁধায় কেবলি লাটিমের মতো ঘুরছে।

এখন তিন বন্ধু—পটকা, জগদ্দল আর লাটিম ভেবে দিশেহারা কি করে তাদের দিন যাবে।

এ. আর. পি'র চাকরির মেয়াদ তো শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এন্তার সিনেমা দেখা, রেস্টুরেণ্টে বসে চপ-কাটলেট ওড়ানো, আর যখন-তখন দামী সিগারেট বের করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি! এর কোনোটাই এখন চলবে না!

বন্ধু মহলে যে খাতির আর প্রতিপত্তি ছিল, তা যদি হঠাৎ একদিন কর্পূরের মত উড়ে যায়···তবে প্রাণ থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান।

পটকা-জগদ্দল-লাটিম ক্রমাগত শিবনেত্র করে ভাবে আর লম্বা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ে!

কিন্তু হাফ-কাপ করে চা নিয়েই বা দোকানের জায়গা আর কতক্ষণ আটকে রাখা যায়? এর ওপর ছারপোকার উপদ্রবও আছে চায়ের দোকানের বেঞ্চে।

জগদ্দল বল্লে, চল ভাই, এখানে সুবিধে হচ্ছে না। রেস্টুরেণ্টগুলো থেকে আমাদের খাতির চলে গেছে। তার চাইতে সোজা হেদোতে গিয়ে বসবি চল।

—হ্যাঁ, যা বলেছিস! ঘাসের ওপর দিব্যি পা ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। টিপ্পনী কেটে বল্লে পটকা।

তিনবন্ধু হাফ-কাপের দাম চুকিয়ে দিয়ে নীরবে ফুটপাথ ধরে হাঁটা শুরু করে দিলে।

হেদোর পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশে সবাই হাত-পা ছড়িয়ে বসল।

জগদ্দল গম্ভীর গলায় বল্লে, বিদেশী সিগারেট খাওয়া ঠিক নয়। আমার সঙ্গে দিশী বিড়ি আছে। চমৎকার মশলা দিয়ে তৈরী। দুটান মেরে দেখ—মগজে দিব্যি বুদ্ধি খেলবে।

যুদ্ধের বাজারে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলে অন্য দুই বন্ধু চাঁটি মেরে তার মগজের ঘিলুকে "সেক্‌দি বটল" করে দিত! কিন্তু এখন কেউ কোনো আপত্তি উত্থাপন করল না। একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে ধূমপান করতে লাগল।

বিড়ি টানতে টানতে পটকা হেদুয়ার জলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রাস্তার গ্যাসের আলো জলের মধ্যে কেঁপে-কেঁপে ভেঙে-ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে-চেয়ে পটকার যেন দিব্য-দৃষ্টি খুলে গেল।

সে হঠাৎ আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সগর্ব্বে ঘোষণা করলে, হয়ে গেছে—

জগদ্দল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, হয়ে গেছে? কি হয়ে গেছে?

লাটিম ফোড়ন কাটলে, আমাদের সুখের পায়রাদের সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে—সেই কথাই কি বলতে চাইছিস?

আবার যেন একটা পটকা ছুঁড়ে দিয়ে পটকা উত্তর দিলে, মোটেই তা নয়। সত্যিকারের সুখের দিন আমাদের আসছে—আর তারই প্ল্যান তৈরী হয়ে গেছে।

গম্ভীর কণ্ঠে জগদ্দল শুধোলে, তা প্ল্যানটা কি আমরা সুস্থির হয়ে শুনতে পাই নে?

পটকা বল্লে, কালকেই তোকে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ে চলে যেতে হবে।

জগদ্দল যেন বিশ বাঁও জলের তলায় পড়ে যায়।

—অ্যাঁ! ঠ্যাংপোতা?···আমি?···সে কি!

পটকা বিজ্ঞের মত উত্তর দিলে, তোর কোনো ভয় নেই! আমার এক দিদিমা সেখানে থাকে। বিরাশী বছরের পাকা থুথুড়ে বুড়ী···কানে কম শোনে ···চোখেও কম দেখে। সেজন্যে তোর কোনো ভাবনা নেই। আমি আর লাটিম রওনা হব দিন কয়েক পর।

জগদ্দল আবার ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন তোলে, অ্যাঁ! ঠ্যাংপোতা গ্রাম? সেখানে আমার কোন কম্ম? এই দিব্যি কলকাতা শহর ছেড়ে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ে? তবে কি আর প্রাণে বাঁচব?

—বাঁচবার জন্যেই তো এই প্ল্যান। হুঙ্কার দিয়ে উঠল পটকা।

—কি করব আমি সেই অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে?

—স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্নাদ্য মাদুলী।

পটকা তার মূল্যবান মত প্রকাশ করে।

—যুদ্ধের পর এখন ঐটের চাহিদাই তো বাজারে বেশী হবে।

জগদ্দল এইবার হেদোর নরম ঘাসের ওপর তার বিরাট বপু এলিয়ে দেয়।

—অ্যাঁ! স্বপ্ন? স্বপ্নাদ্য মাদুলী? তা স্বপ্নই যদি দেখতে হয় তো সেই ঠ্যাং-পোতা গাঁয়ে কেন? কলকাতায় কি সুন্দর স্বপ্ন দেখা যায় না? সিনেমা-ঘরের রঙীন ছবির মতো—লালচে, মিঠে, টক-টক—নোন্তা আর ঝাল স্বপ্ন? যদি বলিস তো আজকেই একবার চেষ্টা করে দেখি—

হুঙ্কার দিয়ে তার উচ্ছ্বাসকে বোতলে ছিপি মেরে বন্ধ করে ফেলে পটকা।

—না, না, কলকাতায় নয়। ওই অজ পাড়াগাঁয়ে—ঠিক ঠ্যাংপোতা গাঁয়েই স্বপ্ন দেখতে হবে। বাঘের স্বপ্ন নয়, সাপের স্বপ্ন নয়—এমন কি ভূতের স্বপ্নও নয়। দেখতে হবে অব্যর্থ স্বপ্নাদ্য মাদুলীর ছবি। দেখতে হবে এমন জায়গায়—যেখানে শহুরে বাবুরা হুট্ করে গিয়ে পৌছুতে পারে না! একেবারে দুর্গমগিরি-কান্তার-মরু পেরিয়ে—যেখানে শুধু গরুর গাড়ীই চলে। নইলে লোকের বিশ্বাস হবে কেন? আর সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বাস নিয়েই তো ব্যবসা! যাকে লোকে বলে—"গুড-উইল"!

এতগুলি কথা এক সঙ্গে বলে উত্তেজনায় পটকা হাঁপাতে লাগল।

জগদ্দল ভয়ে ভয়ে উঠে বসল বন্ধুর বক্তৃতা শুনে। ওর মন রাখবার জন্যে মৃদু-কণ্ঠে বল্লে, তা না হয় স্বপ্ন দেখছি! কিন্তু তোরা আমাকে একা-একা যেতে বলছিস কেন—সেই ধ্যাদ্দেড়ে গোবিন্দপুরে? তোরাও না হয় সঙ্গে চল।

পটকা মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে, উঁহু! এক সঙ্গে গেলে কাজ হবে না। তুই আগে গিয়ে ওখানে স্বপ্ন দেখবি, তারপর আমরা কাগজে কাগজে সেই অলৌকিক ঘটনা ছাপিয়ে দেব, তবে না দেশের লোক জানতে পারবে সেই স্বপ্নাদ্য মাদুলীর কাহিনী।

এইবার জগদ্দলের পাথরের মত মোটা পুরু ঠোঁটেও হাসি জেগে উঠল। সে মাথায় আঙুল চালিয়ে বল্লে, হ্যাঁ, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। এ দেশে স্বপ্নাদ্য মাদুলী ছাড়া আর কোনো উপায় নেই!

এই ঘটনার দিন সাতেক বাদেই—বিভিন্ন দৈনিকে নিজস্ব সংবাদদাতার খবর প্রকাশিত হল—

স্বপ্নে মহাদেবের মাদুলী দান—

সর্ব্বরোগ নিরাময়ের অলৌকিক কাহিনী

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ঠ্যাংপোতা গ্রাম হইতে সম্প্রতি এক অলৌকিক সংবাদ আসিয়াছে। জগদ্দল জোয়ারদার নামে এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত যুবক এক চতুর্দ্দশী রাত্রে স্বপ্ন দেখে—স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব তাহার শিয়রে উপস্থিত হইয়া বলে, বৎস, পৃথিবী বর্ত্তমানে রোগে আর শোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তোমাকে একটি মাদুলী আমি প্রদান করিতেছি। এই মাদুলী ধারণ করিলে সর্ব্বরোগ নিরাময় হইবে। তোমাকে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত কুমার বিবেচনা করিয়া এই মাদুলী তোমার হস্তেই প্রদান করিতেছি এবং ইহার নির্ম্মাণবিধি শিক্ষা দিতেছি। এই বলিয়া তিনি উক্ত ব্রহ্মচারী যুবকের হস্তে একটি মাদুলী অর্পণ করিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যান। নিদ্রাভঙ্গে যুবক আশ্চর্য হইয়া দেখে যে সত্য সত্যই তাহার হাতে একটি তাম্রনির্ম্মিত মাদুলী রহিয়াছে।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অন্ধ, আতুর, বাতের রুগী, হাঁপি, কাশি, আমাশা, অম্লশূল, যক্ষা, উদরাময়ে যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিতেছে তাহাদের ভিড়ে যুবকের গৃহ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যায়। আরও বিস্ময়ের কথা—উক্ত ব্রতধারী ব্রহ্মচারী যুবক মাদুলী স্পর্শে সকলের দীর্ঘকালের ব্যাধি দূর করে। দুইজন জন্মান্ধ নাকি তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়া ব্রহ্মচারীকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। এক জমিদারের মায়ের দীর্ঘকালের হাঁপানি সারিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি উক্ত স্থানে একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও তাহার পারে একটি মন্দির নির্ম্মাণের কাজ শুরু করিয়াছেন!

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক মিছিল করিয়া এই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতেছে। এজন্য এখানে বিশেষ খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে।

এই খবরটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সারা দেশময় একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল।

যেখানে যত পুরোনো ব্যাধির রুগী জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে হা-হুতাশ করছিল আর বৈতরণী পার হবার কথা ভাবছিল—তারা সবাই উৎসাহে শয্যার ওপর উঠে বসল।

বিভিন্ন অঞ্চলের ডাক্তাররা নিজেদের হাত কামড়াতে শুরু করে দিলে। বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ করে দিতে হল।

লোক ছুটতে লাগল উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ওই ঠ্যাংপোতা গাঁয়ের দিকে। কেউ ট্রেনে, কেউ মোটরে, কেউ গরুর গাড়ীতে—আবার কেউবা জলপথে নৌকোয়।

পটকা আর লাটিম এখন লাটিমের মতই বন্ বন্ করে ঘুরছে। পটকা এক-জন ধনী মাড়োয়ারীর অংশীদার হয়ে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ে "আদর্শ হিন্দু হোটেল" খুলে বসেছে, আর রাশি রাশি গরুর গাড়ী জুটিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছে।

এদিকে লাটিম কয়েক বিঘা জমি লীজ নিয়ে নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে মাদুলী তৈরীর একটি কারখানাই খুলে বসেছে। দিন রাত লোক খাটছে সেই কার-খানায়, তবু মাদুলী সাপ্লাই দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না! মনে হচ্ছে গোটা দেশের লোকের জন্যেই প্রচুর মাদুলী চাই।

কিন্তু সব চাইতে বিপদ হয়েছে জগদ্দলের! সারাক্ষণ তাকে ব্রহ্মচারী সাধু সেজে বাঘের ছালের ওপর বসে থাকতে হয়, আর যত বেতো ঘেয়ো আর আমাশার রোগীর বক্-বক্ কথা শুনে জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনাতে হয়। মানুষ-গুলোর ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে—ওরা বুঝি জগদ্দলের পায়ের মাংস অবধি খুবলে নেবে। কেননা পদধূলি আর এক ফোঁটাও নেই—বেমালুম সাফ হয়ে গেছে।

এই সব দুঃখের কথা সে এক দিন রাত্তিরে গোপনে গিয়ে পটকার আদর্শ হিন্দু হোটেলে সব খুলে বলে।

—আর আমি কিছুতেই ব্রহ্মচারী সাধু সেজে দিনরাত বেতো রোগীর

ব্যাজোর-ব্যাজোর শুনতে পারব না। তোরা আমায় রেহাই দে—

পটকা আঁতকে উঠে উত্তর দিলে, তুই বলছিস কি জগদ্দল? এমন চালু ব্যাবসাটা মাটি করে দিবি?

—কিন্তু আমি সর্ব্বক্ষণ পায়ের ধুলো কোথায় পাই বল? ওরা সবাই মিলে যে আমার পায়ের মাংস খুব্‌লে নিচ্ছে!

পটকা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লে, দি আইডিয়া! এই থেকে আমরা একটা 'সাইড্ বিজিনেস' করতে পারি। ব্রহ্মচারীর পদধূলি—এক পুরিয়া চার আনা। যত রাজ্যের ধুলো প্যাকেটে বেঁধে রেখে দেব। বসিয়ে দেব একজন জাঁদরেল চ্যালাকে। সে প্রতি পুরিয়া চার আনা করে বিক্রী করবে। চাই কি আমরা বিদেশেও রেজেষ্ট্রীযোগে পাঠাতে পারব এই ব্রহ্মচারীর পদধূলি! আর কথা বলিস নে! এমন চালু ব্যবসা মাটি করে দেবার কথা মনেও আনিস নে!

চাদরে মুখ ঢেকে রাত্তিরের অন্ধকারে জগদ্দল আবার নিজের আশ্রমে ফিরে এলো।

একদিকে যেমন তিন বন্ধুর স্বপ্নাদ্য মাদুলী প্রবল আলোড়ন আর জনসমাগমের সৃষ্টি করল—অন্যদিকে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠল!

ছোট গাঁয়ের অল্প পরিসরের হাট। সেখানে এসে জুটেছেন বালিগঞ্জের অতি আধুনিকা তরুণীর দল, মধ্যবিত্ত পরিবারের বৌ ঝিরা, পশ্চিম দেশীয় আর মাড়োয়ারী মেয়েরা…এ ছাড়া আশে-পাশের গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতার আসা যাওয়ারও কামাই নেই। ছোট ছেলে-মেয়েরাই যে কত এসেছে—তার লেখা-জোখা নেই!

যে গাঁয়ে দুধ ছিল সস্তা—সেখানে বাচ্চাদের জন্যে এক ফোঁটা দুধ জোগাড় করতে লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে!

এ ছাড়া নেই চাল, নেই ডাল, নেই তরিতরকারী! মাছ তো একেবারে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বলে পরিগণিত হয়েছে!

উপযুক্ত পায়খানার অভাবে গোটা পল্লীটা হয়ে উঠেছে একেবারে নরকের

মত! সবাই নাকে কাপড় দিয়ে হাঁটছে, তবু মিছিল করে লোক আসার কামাই নেই! এর আবার উল্টো দিককার ছবিও আছে।

শহর-অঞ্চলের কাগজে প্রত্যহ ব্রহ্মচারী সাধুর ছবি আর তার বিচিত্র রোগ আরোগ্য করার কাহিনী সবিস্তারে প্রকাশিত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে লোকের আগ্রহের ব্যারোমিটারও এক ধাপ থেকে আর এক ধাপ উঁচুতে উঠছে!

বিদেশ থেকে নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধিরা উড়ে আসছে বিমানে। তারা যে সব 'সন্দেশ' ফলাও করে এয়ার মেলে চালান করে দিচ্ছে তাতে গোটা দুনিয়াটাতেই একটা প্রকাণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে ফেলেছে।

এই স্বপ্নাদ্য মাদুলী সম্পর্কে শিক্ষিত আর অশিক্ষিত মহলে এত বেশী গল্প ছড়িয়ে পড়েছে যে, কেউ যদি এর বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করেছে—তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রহারেন ধনঞ্জয় হতে হচ্ছে! ফলে অবিশ্বাসীদের বিপদ বেড়ে গেছে।

জগদ্দল সাধু হয়ে আটকা আছে বটে, কিন্তু আর দুটি বন্ধুর উদ্যমে এতটুকু ভাঁটা পড়ে নি! তারা স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল চষে ফেলছে। ফলে প্রশংসা-পত্রও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। রাজ্যপাল, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, গায়ক, খেলোয়াড় সবাই লম্বা লম্বা প্রশংসাপত্র লিখে দিচ্ছেন। তাই ছাপা হচ্ছে হাজারে হাজারে। জনসাধারণ সেই সব প্রশংসাপত্র পড়ে আরো দল ভারী করে রওনা হচ্ছে ঠ্যাংপোতা গাঁয়ের উদ্দেশ্যে।

আবার ব্রহ্মচারী সাধুর ছবি তুলে, তাই আর্ট পেপারে ছাপিয়ে দু আনা করে বিক্রী হচ্ছে। তাতেই যে কত টাকা জলের মত আসছে হিসেব রাখা শক্ত।

ইতিমধ্যে কোনো এক ভক্ত রটিয়ে দিয়েছে যে, ব্রহ্মচারী সাধুর একগাছা চুল সংগ্রহ করে যদি বাড়ীতে রাখা যায় তবে সে গৃহে আর কখনো কোনো ব্যাধি হবে না!

জগদ্দলের পক্ষে এর ফল বিষময় হয়ে উঠেছে। এর পর থেকে রাত্তিরে সে নিশ্চিন্তে ঘুমুতেও পারে না। ওৎ পেতে থাকে যেন নিশাচর পেচকের দল। একটু চোখ লেগেছে—অমনি কয়েকটি অদৃশ্য হাত মাথা থেকে চুল ছিঁড়ে

নিতে শুরু করে। যে সব ভক্তরা ওকে পাহারা দেয়—তারাই যে একাজে অগ্রণী এ কথা বুঝতে জগদ্দলের দেরি হয় না!

হায়! হায়! হায়! কি কুক্ষণেই সে ব্রহ্মচারী সাজতে রাজী হয়েছিল!

ভেবেছিল আর ছুটোছুটি করতে হবে না। গদিতে বসে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে দিন গুজরান করবে, আর ঘি, দুধ, হালুয়া, মালপো প্রচুর খাবে।

পটকার ব্যবস্থাপনায় খেতে অবশ্য প্রচুরই পাচ্ছে। কিন্তু দিনে-রাতে তার এতটুকু বিশ্রাম নেই। সারাদিন ক্রমাগত রোগীদের সঙ্গে ঘ্যান-ঘ্যান করো… আর রাত্তিরে যে একটু আরাম করে ঘুমুবে—তারও যো নেই!

এমন করে প্রত্যহ চুল ছিঁড়লে মানুষ নিশ্চিন্তে কখনো ঘুমুতে পারে? একেই বুঝি বলে, বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়ানো!

আর কিছুদিন এইভাবে কাটালে সে বুঝি সত্যি পাগল হয়ে যাবে! তখন তার আর দুই বন্ধু যে তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে না—সে বিষয়ে কোনো কথাই হলফ করে বলা চলে না!

মোদ্দা জগদ্দল কেবল ভাবে আর ঘামে!

হঠাৎ ইতিমধ্যে নাটকের চরম-মুহূর্ত্ত এসে উপস্থিত হল। অব্যবস্থা, অনিয়ম আর স্বাস্থ্যবিরোধী দিন যাপনের ফলে ঠ্যাংপোতা গ্রামে ও আশেপাশে কলেরা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ল!

মানুষ মরতে লাগল পোকার মত। কিন্তু এমনি মজা যে, তবু দলে দলে লোক আসার কামাই নেই!

এই সব কাণ্ড দেখে সরকার শঙ্কিত হয়ে ঠ্যাংপোতা গ্রামে যাবার সমস্ত টিকিট বন্ধ করে দিলেন। ওখানে কিম্বা আশেপাশের কোনো স্টেশনেই ট্রেন থামবে না। তাতেও নিস্তার নেই।

হাঁটাপথে আর নৌকোয় তবু ক্রমাগত মিছিল এগিয়ে যেতে লাগল। তখন সরকার বাধ্য হয়ে নাটের গুরু জগদ্দলকে গ্রেপ্তার করলেন।

খবর পেয়ে বন্ধুরা ছুটে এলো। জামিনের জন্যে তদ্বির করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই জামিন পাওয়া গেল না!

কোর্টে দাঁড়িয়ে জগদ্দল হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, খবরদার, যে কেউ আমার জন্যে জামিনের তদ্বির করবে—তাকে আমি খুন করব। পুলিস যে আমার কি উপকার করেছে তা আমিই জানি। নাছোড়বান্দা ভক্তদলের হাত থেকে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে ওরাই। এইবার জেলে গিয়ে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে চাই।

এই বলে সে প্রকাণ্ড হাই তুলে ডান হাতে তুড়ি মারতে লাগল।

আসামী পক্ষের উকিলের মুখে আর বাক্যি নেই!

ফ্যানের ফ্যাসাদ

পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ ফ্যানের আর্তনাদ নয়, 'ফ্যান'—অর্থাৎ সবাই যাকে বৈদ্যুতিক পাখা বলে জানে তার সঙ্গসুখে কি ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়েছিল সেই কথা ভেবে আজও আমি আঁতকে উঠি।

সেই সময়কার কাহিনী—যখন কলকাতা থেকে পালাই-পালাই রব উঠেছে! গরু-জরু বাসন-কোসন সমেত সবাই মুক্তকচ্ছ হয়ে বহু যুগের ভুলে-যাওয়া পল্লীমায়ের কোলে আশ্রয় লাভের জন্যে ছুটে চলেছে। অনেকে নিজের শহরের বাড়ী অন্যের হাতে গছিয়ে দিয়ে বলছে, তোরা সব বাস কর ভাই; যদি ফিরে আসি তখন আবার দেখা হবে। কথাটা অবশ্য উল্‌টো করে বলা হয়। বলা উচিত ছিল, যদি কলকাতা শহর বাঁচে, যদি বাড়ী টিঁকে যায় এবং বোমার হাত থেকে তোরা রক্ষা পাস্—তখন ফিরে এসে দখলী সত্বের দাবি করা যাবে।

এমনি যখন গোটা শহরের অব্যবস্থা এবং প্রত্যেকের নাড়ীতে উনপঞ্চাশ বায়ু ভর করেছে, সেই সময় এক দিন সন্ধ্যেবেলা আমার ভাড়াটে বাড়ীর কড়া নড়ে উঠল। বহু গেরস্ত নিয়ে জীর্ণ একখানি বড় বাড়ী। প্রত্যেকে একখানি করে ঘর নিয়ে বসবাস করে। আমার ঘরখানি সদর দরজার কাছে বলে কড়া নাড়ায় আমাকেই সব সময় সাড়া দিতে হয়।

দরজা খুলে দাঁড়াতেই দেখি, বন্ধু বিমলেশ বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে। সামনে রিক্সার ওপর একটি সিলিং ফ্যান শায়িত। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি রে!

বিমলেশ বল্লে, কাল সকালের ট্রেনেই সবশুদ্ধ দেশে চলে যাচ্ছি। জানি তুই কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবি, তাই আমার ফ্যানটা তোর কাছে রেখে যাচ্ছি। ও এক রকম দিয়ে যাওয়াই বল্। যদি কোনো দিন ফিরে আসি আর কলকাতা শহর টিঁকে থাকে তখন কথা হবে। আমার মাত্র একখানি ঘর; তাই আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পেছন থেকে গৃহিণীর চাবির রিং শব্দ করে জানিয়ে দিলে যে আমার আপত্তি থাকলেও তিনি বিশেষ অনিচ্ছুক নন। শেষ পর্যান্ত বিপন্ন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সম্মতি দান করতেই হল।

মাথার ঠাকুর হয়ে ফ্যান আমাদের শিরোদেশের ঊর্দ্ধে সানন্দে অবস্থান করতে লাগলেন। ইলেক্‌ট্রিক চার্জ্জ কিছু বাড়বে, তা বাড়ুক। গিন্নী খুশী হলেন এবং ছেলে-মেয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

সত্যি কথা বলতে কি, ঘরখানিতে আলো-হাওয়া একেবারে প্রবেশের পথ পায় না। আমি দিবারাত্র ইন্সিওরেন্সের দালালি করে ফিরি। তবু যা হোক বাইরের আলো-হাওয়া গায়ে লাগে। এ বেচারীরা বন্ধ ঘরে সেদ্ধ হয়। তা না হয় ইলেক্‌ট্রিক চার্জ্জ একটু পড়বে, ওরা তো কিছুদিন পুরো ফুস্‌ফুস্ নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারবে। মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস আমিও ফেললাম।

বাইরের টাট্টু ঘোড়া আমি…অন্দর মহলের কোনো সুখ-সুবিধেই দেখতে পারি নে। সেটাও তো আমার একটা অপরাধ।

এই ব্যাপারে খানিকটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

এই ঘটনার দিন কয়েক পর একদিন দুপুর বেলা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ফিরে দেখি পুরোদমে ফ্যান খুলে গৃহিণী চুল শুকোচ্ছেন। দেখে ভারী কৌতুকবোধ করলাম। শ্রান্তি বিনোদনের জন্যেই তো ফ্যান। অন্য দিকেও যে এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

বল্লাম, বুদ্ধিটা বের করেছ তো মন্দ নয়। মাথা ঠাণ্ডা আর চুল শুকোনো এক সঙ্গে চলছে।

গৃহিণী খুশী হয়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ ফুলফোর্সে ফ্যান খুলে দিয়ে চুল

শুকোতে ভারী আরাম।

শুনে আমারও কম আরাম বোধ হল না! এ যেন রৌদ্রদগ্ধ মরুভূমিতে ওয়েসিস বিশেষ।

সে দিন বহু ঘোরাঘুরি করেও ইন্সিওরেন্সের একটি মক্কেল বাগাতে পারলাম না। বাড়ীতে মেয়ের অসুখ চলছে—কিছু কাঁচা টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কোম্পানীতে কিছু আগাম টাকা চাইতে তাঁরাও বিশেষ অনিচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। মন-মেজাজ খারাপ করে বাড়ী ঢুকতেই দেখি অসুস্থ মেয়েটা মেজেতে শুয়ে আছে…পুরোদমে ফ্যান ঘুরছে আর পাশের ঘরের মিত্তির-গিন্নী সেই হাওয়াতে নিজের ছেলের কাঁথা শুকোচ্ছেন। গিন্নী রয়েছেন হেঁসেলে।

দ্বিতীয় রিপু সপ্তমে চড়ে গেল, গিন্নীকে গিয়ে বল্লাম যে, এইভাবে যদি ফ্যান চলে তবে ওটা বিক্রি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মেয়ের চিকিৎসার খরচ চলছে না, আর পুরোদমে ফ্যান চালিয়ে আমার ঘরে কাঁথা শুকোনো হচ্ছে? ব্যাপারটা কি বল তো?

গিন্নী আমায় থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, আহা চুপ করো, মিত্তির-গিন্নী শুনতে পাবেন যে! দুদিন থেকে সূয্যি ঠাকুরের মুখ দেখা যাচ্ছে না! কাঁচা পোয়াতির কাঁথা না শুকোলে ছেলেটা বাঁচবে কি করে? তাই আমিই তো ফ্যান চালিয়ে একটা কাঁথা শুকিয়ে নিতে বলেছি। প্রতিবেশী লোকের কত সুখ-সুবিধে দেখে, আমরা এইটুকু পরের ভালো দেখতে পারব না? তোমার এ কি রকম এক-চোখো কথা?

অকাট্য যুক্তি।

সুতরাং এর ওপর আর কোনো কথা চলে না। ফ্যানের হাওয়ায় মেয়েটির অসুখ বাড়ুক, তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু প্রতিবেশীর কাঁথা শুকিয়ে দিতেই হবে! বুঝলাম, পরের উপকারের ব্যাপারে 'কপালকুণ্ডলার' নবকুমার হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পরের জন্যে কাঠ কাটতেই হবে।

এর পর 'বোবার শত্রু নেই' নীতি অবলম্বন করে চুপচাপ অবস্থান করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঠাণ্ডা লেগেই হোক, আর যে করেই ঘটুক হঠাৎ মেয়েটার অসুখ খুব বেড়ে গেল।

তারপর চল্লো যমে-মানুষে টানাটানি! একমাস ধরে আমি আর গৃহিণী রাত দিন জেগে শুশ্রূষা করে অনেক কষ্টে যখন মেয়েটাকে সুস্থ করে তুললাম তখন গৃহিণীর গাত্রে অলঙ্কার বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না!

দীর্ঘকাল অবরোধে আটকা থেকে তার মেজাজটিও হয়ে উঠেছে আগুনে কাঁঠালের বীচির মত! বুঝলাম তার মনটাকে পরিবর্ত্তন করার একটা প্রয়োজন আছে। অল্প পয়সায় এর অমোঘ ঔষধ হচ্ছে সিনেমা। পাড়ায় একটি হাসির ছবি দেখানো হচ্ছিল। স্থির করলাম ছেলে-পুলে ঘুমোলে রাত্তিরের শোতে গৃহিণীকে নিয়ে সেখানে যাব। আমাদের পাশের বস্তিতে থাকে ডুমুরিয়ার মা। ঘুঁটে বেচে কোনো রকমে দিন গুজরান করে। স্ত্রীর ভারী বাধ্য সে। মেঝেতে শুয়ে থেকে ছেলে-মেয়ের পাহারা দেবে।

নিশ্চিন্ত মনে দুজনে সিনেমা দেখতে চলে গেলাম। ফিরতি মুখে চেপে বৃষ্টি এলো। ভিজে কাক হয়ে দুজনে বাসায় ফিরে এলাম।

অবাক হয়ে দেখি সদর দরজা হা-হা করছে খোলা। চোর-টোর আসে নি তো? এগিয়ে নিজেদের কামরার কাছে এসে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। আর আমাদের ডুমুরিয়ার মা পুরোদমে ফ্যান খুলে দিয়ে মেঝেতে ঘুঁটে শুকোচ্ছে।

ব্যাপার দেখে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। আমার মুখচোখের অবস্থা দেখে গৃহিণী তাড়াতাড়ি ঠেলে আমায় রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলেন এবং বল্লেন, তাড়াতাড়ি রাত্তিরের খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে। বেশী রাত্তিরে খেলে আমার নাকি আবার অসুখ করবে।

ভিজে কাপড়েই রান্নাঘরে বসে ভাত গিলতে লাগলাম। পরের দিন সকালের ডাকে "বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের" বিল পেলাম ৭২৮০ মাত্র।

ভাবলাম বিল ও পাখা দুটোই এক যোগে বন্ধু বিমলেশের দেশের বাড়ীতে প্যাক করে পাঠিয়ে দেওয়া যায় কি না!

সেয়ানে সেয়ানে

জীবনটাকে ঘষা পয়সার মত মনে হচ্চে ত্রৈলোক্য তালুকদারের।

যা হোক একটা চাকরির জন্যে গোটা-শহরকে সে চষে ফেলেছে। এতক্ষণ ধরে দেশের জমিতে চাষ করলে যা হোক একটা ফসল জন্মাত। গত কয়েক মাস ধরে সে পায়ে হেঁটে যে পথখানি অতিক্রম করেছে, ফিতে মেপে তার পরিমাণ করলে অনেক বড অভিযানে সে সাফল্য লাভ করতে পারত—এই কথাটাই অতি সহজে প্রমাণিত হবে।

কিন্তু সমস্ত হাঁটাহাঁটিই তার এক কলসী জলে এক ফোঁটা চোনার কাজ করেছে!

ছেলেবেলা থেকে সে শুনে আসছে—ভদ্রলোকের এক কথা। কিন্তু কলকাতা শহরের সমস্ত অফিসের বড়বাবুরা একজোট হয়ে যে ভদ্রলোক সেজে বসে আছে, এ কথা তার আদৌ জানা ছিল না।

যেখানেই যাও শুধু এক কথা, "খালি নেই।" আপন মনেই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠে ত্রৈলোক্য তালুকদার।—খালি নেই তো তোমরা দু'চারজন পটল তুলে জায়গা খালি করে দিতে পার না? অনেকের তো তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! ভাল করে চোখে দেখতে পায় না, চুল পেকে শনের দড়ি হয়েছে, দাঁত নড়বড় হতে হতে পড়ে গিয়েছে, কোমর গিয়েছে বেঁকে, হাতে লাঠি উঠেছে…তবু চাকরি করার শখ যায় না!

যম কি এদের ভুলে বসে আছে নাকি?

ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা ত্রৈলোক্যের। রাত্তিরে দু ডজন রুটির কমে পেট ভরে না। তারই তো চাকরি পাওয়ার প্রয়োজন সব চাইতে বেশি।

যারা ক্রমাগত অম্বলে ভুগছে, দুবেলা ঢেকুর তুলছে, ক্রমাগত লেবু-জল গিলে পৈতৃক প্রাণটাকে ধাতস্থ রেখেছে···তাদের কি বেঁচে না থাকলেই নয়? কেবলই ওরা সুদের হিসেব কষছে কিম্বা ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমাচ্ছে।

এ যুগে সুবিধেবাদীদেরই জয়জয়কার।

ত্রৈলোক্য সুবিধে সংগ্রহের চেষ্টা যে আদৌ করে নি—সে কথা কোনও ক্রমেই বলা চলে না।

ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিলে যোগ দেবার চেষ্টা করেছে, সবাই পেয়েছে 'বাহোবা' —আর ওর কপালে জুটেছে প্রহার! খবরের কাগজ বিক্রি করবার কাজে লেগেছে। লোকে তার হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—উপরন্তু কেউ পয়সা দেয় নি।

'ধুত্তোর' বলে ছেড়ে দিয়েছে সে কাজ।

উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিশে জমি দখলের চেষ্টা করছে। সবাইকার ভাগ্যে জুটেছে পাঁচ কাঠা করে জমি···আর জমির মালিক কিনা তার তোলা কুঁড়েঘরই দিয়েছে ভেঙে!

কিছু দিন সিনেমার টিকিট কিনে চড়া দরে বিক্রি করবার চেষ্টাও করেছিল ত্রৈলোক্য। তার ফলে—একদিকে বনিয়াদী গুণ্ডার দল, আর অন্যদিকে পুলিস —উভয়ের কাছ থেকেই পেয়েছে গুঁতো।

এতেও যদি জীবনটাকে ঘষা পয়সার মত মনে না হয়, তবে আর কিসে হবে শুনি?

একবার বেপরোয়া হয়ে পুরোনো খবরের কাগজ শিশি-বোতল বই-পত্তর ইত্যাদি কিনে বিক্রির তালে ছিল। কিন্তু তার ঝুলির মধ্যে নাকি কি করে একখানি নিষিদ্ধ-পুস্তক পাওয়া যায়।

ফলে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে যায়—আর দশ দিন হাজত-বাস ঘটে ওর।

ওরা খেতে দিত বসিয়ে, কিন্তু মশার কামড়ে গা ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গিয়েছিল।

জেলের ভেতরে, কি জেলের বাইরে কোনো দিকেই কোনো সুবিধে নেই

দেখে, সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কেদার-বদরীর পথে রওনা হবে কিনা—এই কথাই যখন মনে মনে আলোচনা করছিল, এমন সময় গ্রামসম্পর্কে এক জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে একখানি পোস্টকার্ড পেয়ে সন্ন্যাস-গ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখল সে।

দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই জানিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ের বিয়ে হঠাৎ ঠিক হয়েছে। সময় একেবারে হাতে নেই বললেই হয়। সুতরাং বিয়ের সমস্ত জিনিস-পত্র তাকেই কেনা-কাটা করে দিতে হবে। গ্রামে সবাই জানে—মহানগরী কলকাতায় ত্রৈলোক্য ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য করে। সুতরাং শহরে এমন একটি করিৎকর্মা ভাইপো থাকতে জ্যাঠামশাই তাঁর মেয়ের বিয়েতে আর কার শরণাপন্ন হবেন? মনিঅর্ডার যোগে টাকা আসছে—এই সুখবরটিও পোস্টকার্ডের এককোণে লেখা আছে।

বিয়ের সওদা যখন—তার থেকে বেশ কিছু হাত-টানে সরিয়ে রাখা যাবে। তা ছাড়া বিভিন্ন দোকানে বাজার করার সময় ক্রেতা হিসেবে কিছুটা কমিশনও কি না মিলবে?

একেবারে ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ত্রৈলোক্য। স্রোতের তোড়ে ভেসে যাওয়ার সময় মানুষ সামান্য খড়কুটো দেখলেও তাকে আঁকড়ে ধরে।

ত্রৈলোক্য তার ছারপোকা-কণ্টকিত তক্তাপোশের ওপর বসে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

দুদিন পরই মনিঅর্ডার যোগে দেড় হাজার টাকা এসে পড়ল।

ত্রৈলোক্য চিরকালই হিসেবে পাকাপোক্ত। বিয়েরও সব জিনিস কেনা-কাটা হয়, অথচ তার হাতে বেশ কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকে—এমনি একটা ফন্দি সে তৈরী করে ফেললে।

অনেক দোকানের সঙ্গে তার জানা-শোনা ছিল। সেখানে দরেরও একটা সুবিধে করে নিতে পারল।

ওদের গ্রামের একজন লোক দু-চার দিনের মধ্যেই দেশে ফিরবে। তার সঙ্গে সব জিনিস পাঠিয়ে দিতে হবে।

সওদা করতে ত্রৈলোক্যের খুব বেশি দেরি হ'ল না। সমস্ত কিছু প্যাক করে পাঠিয়ে দিয়ে দেখলে, ১৭৩৬০ সে বাঁচাতে পেরেছে।

সমস্ত হিসেব পরিষ্কার হয়ে যাবার পর ত্রৈলোক্য সবিস্ময়ে দেখলে একশ তিয়াত্তর টাকার মধ্যে তিনটি টাকা অচল।

তাকে কে ঠকিয়ে দিল—এই কথা ভেবে ওর ভারি অবাক লাগল।

এ যে একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

এই তিনটি অচল টাকা সে নানা ভাবে চালাবার চেষ্টা করলে। বাজারে, ট্রামে, বাসে, খাবারের দোকানে, ধুতি কিনতে গিয়ে সে বহু রকম কসরৎই করল, কিন্তু মুস্কিল এই যে, সবাই টাকা তিনটি ফেরত দেয়। ত্রৈলোক্যেরও কেমন যেন রোক্ চেপে গেল –ছলে-বলে-কৌশলে যে ভাবে হোক টাকা তিনটি কারো কাছে চালাতেই হবে।

সে পা ছড়িয়ে বসে ভাবতে লাগল—না বাজিয়ে টাকা কে কে নেয়?

এক নেয় ডাক্তার। আর সিঁদুর মাখিয়ে যদি চালানো যায় তবে ধর্মস্থানে নিতে পারে। কিন্তু মঠে-মন্দিরে অর্থ দান করবার তার মোটেই বাসনা নেই। তার শরীরে কোনো রোগ-বালাই নেই—একমাত্র ক্ষিদে ছাড়া। কাজেই দুটো ব্যাপারই বাতিল।

খাবারের দোকানে চালাতে পারলেই ওর মনটা খুশী হ'ত সব চাইতে বেশি। কিন্তু ব্যাটারা এমন চালাক যে হাতে নিয়েই টের পায়!

সংসারে একমাত্র সেই কি বোকা? যত এই কথা ভাবে—ততই তার আক্রোশ বাড়তে থাকে।

একদিন কলেজ স্কোয়ারের পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিল -উদ্দেশ্য কোন একটি ভালো খাবারের দোকানে কিম্বা সরবতের আখড়ায় ঢুকে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে নেবে।

হঠাৎ তার চোখ পড়ে গেল—গোলদীঘির রেলিঙের পাশে বসা একজন গণৎকারের দিকে।

দিব্যি নাদুস-নুদুস চেহারা, দীর্ঘ জটা, দাড়ি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা।

সামনে নানা রকম ছক কাটা, কতকগুলি প্রাচীন জ্যোতিষের পুঁথি—আরো নানান্ রকম জিনিস। লোকটি গুণী নিশ্চয়ই, না হলে এমন রাসভারী চেহারা হয় ?

ত্রৈলোক্য তালুকদার এক মুহূর্ত ভেবে নিলে, জ্যোতিষী ভাগ্য পরীক্ষা করে তার ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারবে না ? পকেটের মধ্যে তিনটি অচল টাকা সে আঙুল দিয়ে ভালো করে টিপে দেখলে, তারপর গণৎকারের সামনে গিয়ে বসে পড়ল। ভক্তি ভরে একটা প্রণাম করতেও সে ভুলল না।

সাধুবাবার বোধ করি কৃপা হ'ল। তিনি মুখ তুলে ত্রৈলোক্যের দিকে তাকালেন। তারপর একবার চোখটা বুঁজে নিয়ে বললেন, তোমার মনে বড় অশান্তি বাবা। আচ্ছা, বোসো এই ইটটার ওপর—আমি হাতটা একবার দেখব।

গণৎকার ঠাকুর ওকে ছুঁয়ে চোখ বুজে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর ত্রৈলোক্যের হাতটাকে টেনে নিলেন নিজের কোলের ওপর। একবার হাতটা উপুড় করে, একবার চিৎ করে নানাভাবে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর মাটিতে চক দিয়ে বহু দাগ কেটে অনেক সংখ্যা বসালেন, কাটাকাটি করলেন, আরও অনেক দাগ কাটলেন—তারপর আপন মনেই মাথা নাড়তে লাগলেন।

ত্রৈলোক্য এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে গণৎকার ঠাকুরের কাণ্ড দেখছিল। এইবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, সাধুবাবা, আমার তা হলে কি গতি হবে ? আপনি দয়া করে ভবিষ্যতটা একটু বলে দিন।

সাধুবাবা আরো কিছুটা সময় পাথরের মূর্তির মত অচলভাবে বসে রইলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, দেখ বাবা, রাহু তোমার উন্নতির স্থানে বসে আছে—

ত্রৈলোক্য উত্তেজিত হয়ে বললে, আপনার তো অসীম ক্ষমতা, রাহু বেটাকে সেইখান থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে পারেন না ?

তেমনিভাবে চোখ বুজেই সাধুবাবা উত্তর দিলেন, গুরুর কৃপায় তা কিছু কিছু পারি বৈকি! একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, আর একটা মাদুলী ধারণ করতে হবে তোমাকে।

কথাটা শুনেই ত্রৈলোক্যের হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। একে 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন' তার ওপর আবার মাদুলী-ধারণ! গণৎকার কত টাকা চেয়ে বসেন কে জানে!

তবু ভয়ে ভয়ে শুধোলে, বেশী খরচপত্র করবার সাধ্যি তো আমার নেই··· আপনিই তো বললেন, রাহু পথ আগলে বসে রয়েছে। তবে যৎসামান্য ব্যয় করলে যদি উপকার হয় তো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তা যৎসামান্য বৈকি! নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন সাধুবাবা। পাঁচটি টাকা তোমায় খরচ করতে হবে। অবশ্য পূজোর উপকরণ সব আমিই সংগ্রহ করে দেব। গরীব মানুষ তুমি পাবে কোথায়?

ত্রৈলোক্য গণৎকার ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে বললে, যথার্থ বলেছেন আপনি,—বড় গরীব আমি। পাঁচ-পাঁচটা টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তা হলে সারা মাস না খেয়ে থাকতে হবে। আপনি তিনটে টাকা নিয়ে আমায় কৃপা করুন। তারপর একবার রাহু ব্যাটা যদি পথ ছেড়ে দেয় তখন আমি সোনার বিল্বপত্র আপনার পায়ে এনে উপহার দেব।

এই কথায় গণৎকার ঠাকুর একটু সিক্ত হলেন বলে মনে হ'ল।

উত্তর দিলেন, আচ্ছা বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে তুমি, গ্রহের ফেরে পড়ে গেছ—আমি এই তিন টাকাতেই তোমার গ্রহ-শান্তি করে দেব। কিন্তু দেখ বাবাজী, পরে যেন খেয়া পার হয়ে আমায় ভুলে যেও না।

ত্রৈলোক্য জিব কেটে, দুটো কান আর নাক মলে উত্তর দিলে, ঠাকুর, তা হলে আমার নরকেও স্থান হবে না। আপনি শুধু ঐ রাহু ব্যাটাকে ঠেলে-ঠুলে একটু বেকায়দায় ফেলে দিন, তারপর আমি দেখে নিচ্ছি। একটু যদি সুদিন ফিরে আসে তবে আপনাকে দু-হাত ভরে দেব। তখন দেখে নেবেন সাধুবাবা, আমার যে-কথা সেই কাজ।

গণৎকার ঠাকুর বললেন, তা হলে বাবাজী, তিনটি টাকা দিয়ে যাও। আমায় আবার কালীঘাট গিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। একটা হোম করে মন্ত্র পড়ে মাদুলী তৈরী করতে হবে। খাটুনি কি সোজা! তুমি তো তিনটা টাকা দিয়েই খালাস!

ত্রৈলোক্য তখন ভক্তিভরে আর একবার গণৎকারের পায়ের ধুলো নিয়ে কাগজে-মোড়া তিনটি টাকা দিয়ে চট্ করে উঠে দাঁড়াল।

মনে মনে ভয় আছে, যদি গণৎকার টাকা বাজিয়ে দেখতে চায় তা হলেই তো সঙ্গে সঙ্গে অচল টাকা ধরা পড়ে যাবে।

দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিলে ত্রৈলোক্য। গোলদীঘির আর একটা কোণে পৌঁছে এক মুহূর্তের জন্যে পেছন ফিরে তাকাল সে। নাঃ, ভয়ের কোনো কারণ নেই। কাগজমোড়া টাকা তিনটি একবার কপালে ছুঁইয়ে কৌটোর মধ্যে রেখে দিলেন গণৎকার ঠাকুর, একবার খুলে পর্যন্ত দেখলেন না।

এইবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল সে। যাক্, টাকা তিনটিরও একটা হিল্লে হ'ল, আর মাদুলি ধারণের ফলে রাহু ব্যাটা যদি জব্দ হয় তবে নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে অবস্থাটা ফিরিয়ে নিতে পারবে। দুদিন পর ভয়ে ভয়ে গিয়ে হাজির ত্রৈলোক্য।

এই যে, এসো বাবাজী, এসো।—আন্তরিকতার সুরে ডেকে বসালেন গণৎকার ঠাকুর।

একটি লাল সুতোয বাঁধা মাদুলী তার ডান হাতে পরিয়ে দিলেন, আর হোমের একটা ফোঁটা দিলেন ওর কপালে। বললেন, এতেই তোমার গ্রহশান্তি হবে।

ভক্তিভরে ত্রৈলোক্য তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে জিবের আগায ঠেকিয়ে উত্তর দিলে, সবই আপনার দয়া।

সাধুবাবা ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করে গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি কে? সবই মা জগদম্বার ইচ্ছে। যজ্ঞ করার সময় আদেশ পেয়েছি, তোমার ভালই হবে। তারা—তারা মা—

ত্রৈলোক্য যেন ওখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে! তাড়াতাড়ি চলে আসছিল। গণৎকার ঠাকুর ডেকে বলে দিলেন, এক মাস বাদে আমার সঙ্গে এইখানে এসে দেখা করবে। যদি এর মধ্যে কোন সুফল না পাও তো মায়ের কাছে আবার আর্জি পেশ করতে হবে।

এইবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে ত্রৈলোক্য জবাব দিলে, আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম।

ওপরের ঘটনার পর দিন-কুড়ি কেটে গেছে, উন্নতি হওয়া তো দূরস্থান, ওর জ্যাঠার মেয়ের বিয়ের সওদা করে যে ক'টি টাকা ত্রৈলোক্য জমিয়েছিল, তাও একদিন ওর ঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে।

সে মনে মনে চটে আছে গণৎকার ঠাকুরের ওপর। কিন্তু এক মাস পূর্ণ না হলে তো যেতে পারে না! তাই কেবলি দিন গুনছে সে।

সেদিন কি একটা কাজে গোলদীঘির সামনে দিয়ে ত্রৈলোক্য যাচ্ছিল, গণৎকার ঠাকুরই দেখতে পেয়ে ডাকলেন ওকে। ত্রৈলোক্য ভাবলে, ভালই হয়েছে। বেশ কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে দেওয়া যাবে এই ফাঁকে।

কিন্তু গণৎকার রেগে টং। বললেন, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে চালাকি? আমাকে তিনটে অচল টাকা ফেলে দিয়ে গেছ? কোথাকার জোচ্চোর তুমি! আগে ফেল টাকা।

ত্রৈলোক্যও দমবার ছেলে নয়। বললে, তোমার মাদুলিতেও তো কোন কাজ হ'ল না সাধুবাবা! উল্টো আমার যা পুঁজি ছিল চুরি হয়ে গেল! কেন দেব ভাল টাকা শুনি?

গণৎকার ঠাকুর হঠাৎ পৈতে ছুঁয়ে বললে, উচ্ছন্নে যাবি, উচ্ছন্নে যাবি··· তে-রাত্তির পোয়াবে না। সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা? তুই যে লোক খারাপ তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই ওই মাদুলিতে আসল মন্ত্র পড়ে দিই নি। ওই মাদুলির ভেতর কি আছে জানিস? শুকনো বেলপাতা। আমি বলে দিচ্ছি, ওই কুপিত রাহুই তোর সর্বনাশ করবে।

ত্রৈলোক্য এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর হো-হো করে হেসে উঠে জবাব দিলে, জোচ্চোর তুমিও তো কম নও ঠাকুর! তুমি আমাকে উচ্ছন্নে যাবার অভিশাপ দিলে না ঠাকুর? কিন্তু জিজ্ঞেস করি, ভণ্ড তপস্বী, শকুনের শাপে কি গরু মরে?

সত্যি! এমন মুস্কিলেও মানুষ পড়ে!

এত আনন্দের মধ্যেও এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় বিরিঞ্চি যেন ঝুলতে থাকে।

জীবনে এই প্রথম বই বেরুবে বিরিঞ্চির—তাই জানা-অজানা সবাইকার কাছে গল্প করে বেরিয়েছে।

যারা জানে বিরিঞ্চি গল্প লেখে তাদের মধ্যে কেউ মাথা নেড়েছে, একটু বয়স্করা উৎসাহ দিয়েছে, কেউ কেউ মুখ বাঁকা করে ঠোঁট উল্টিয়েছে কৌতুকে।

কিন্তু কোথাও সে বিপদে পড়ে নি।

—"অবশেষে বাধা পেলে এই শতদ্রু তীরে!"

বিপদেরও তো রকম ফের থাকে!

কারো সঙ্গে ঝগড়া হলে মিটিয়ে নেওয়া চলে, টাকা ধার থাকলে অন্য জায়গায় নতুন ঋণ করে শোধ দেওয়া চলে, পুলিসের খপ্পরে পড়লে টাকাটা-সিকিটা গুঁজে দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায়…। কিন্তু এ যে তিন মোক্ষম জায়গা!

তাই বিরিঞ্চি ভাবতে লাগল কাকে চটাবে সে।

বিরিঞ্চির যখন খুব দুরবস্থা…তখন কোন এক বড়লোকের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়ে সে ঘর-জামাইয়ে পরিণত হয়। অবশ্য সেতু হিসেবে কাজ করেছিল এই গল্প। ভাগ্যিস সে গল্প লিখতে পারত…তাই তো আজ সে ঘরজামাই। স্ত্রী মনিবে পরিণত হয় যদি প্রতি মাসে মোটা টাকা তার বাপের বাড়ি থেকে মণি-অর্ডার যোগে হাতের মুঠোয় এসে পৌছয়।

স্ত্রী মণিকা মৃদু হেসে অনুরোধ করেছে—তোমার এই প্রথম উপন্যাসখানি কিন্তু আমার নামে উৎসর্গ করতে হবে।

বিরিঞ্চি শান্ত-সুবোধ ছেলেটির মত ঘাড় কাত করে উত্তর দিয়েছে—সে কথা আর বলতে!

আর একটি মহিলার সঙ্গে বিরিঞ্চির দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা। ছেলেবেলায় একবার বিয়ে হবার কথাও হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত গরীবের মেয়ে বলে বিরিঞ্চিই সাহস পায় নি। মহিলাটি আজ একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। আজও তার বিয়ে হয় নি। করুণার আরও একটি গুণ আছে। মুক্তোর মত তার হস্তাক্ষর। বিরিঞ্চির সব গল্প করুণা নকল করে দেয়। পূজা সংখ্যার জন্যে যখন লেখকের ফরমাস আসে ডজনে ডজনে···তখন এই করুণার কারুণ্যই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। অনেক সময় বিরিঞ্চি মুখে-মুখে গল্প বলে যায় আর করুণা দ্রুত লিখে যায়। এই ভাবে 'অর্ডার-সাপ্লায়ে'র কাজ চলে। করুণার একটা মস্ত বড় গর্বের কথা যে, বিরিঞ্চির সব গল্প ও কাহিনী সকলের আগে সে পড়তে পারে। তাই তো সে প্রায়ই বলে, হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকা যতই তোমার গল্পের সুখ্যাতি করুক···কিন্তু করুণা পড়ে সেটি সকলের আগে। এই কথাটি ভুলো না কিন্তু—

বিরিঞ্চি করুণার কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ।

সেই করুণা অনুরোধ করেছে—তোমার প্রথম বইখানি কিন্তু আমার নামে উৎসর্গ করতে হবে।

বিরিঞ্চি নিজের মান বাঁচাবার জন্যে বলেছে, তোমাকে নয় তো আবার কাকে দেব?

ইদানীং কোন একটি সিনেমার মহরৎ অনুষ্ঠানে তারকা বিদ্যুৎশিখার সঙ্গে বিরিঞ্চির আলাপ হয়েছে। বিদ্যুৎশিখা অনেকদিন থেকেই বিরিঞ্চির লেখার বিশেষ ভক্ত। পরস্পরের আলাপের পর সেই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে উভয় পক্ষ থেকেই।

বিদ্যুৎশিখা বিরিঞ্চির প্রথম উপন্যাসের ফর্মাগুলি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলে এত

বেশী অভিভূত হয়েছে যে, নিজেই চেষ্টা করছে তার চিত্ররূপ দেবার জন্তে। বিদ্যুৎশিখা নাকি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবে।

এই আশায় উৎসাহিত হয়ে বিরিঞ্চি ঘন ঘন বিদ্যুৎশিখার গৃহে যাতায়াত করছে।

এক মধুর সন্ধ্যায় নিজের হাতে কফি ঢেলে দিতে দিতে বিদ্যুৎশিখা বিলোল-কটাক্ষে বলেছে, বিরিঞ্চিবাবু, আমি যখন হাত দিয়েছি—আপনার বই তখন সিনেমাতে হবেই। তবে আমার একটি অনুরোধ আছে --

বিরিঞ্চি উত্তর দিয়েছে অনুরোধ কেন, বলুন আদেশ—

বিদ্যুৎশিখা কফির কাপে আর একটু দুধ ঢেলে দিয়ে বলেছে - আপনার প্রথম উপন্যাসখানি কিন্তু আমার নামে উৎসর্গ করতে হবে। নইলে আমি কিছুতেই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করব না --

বিরিঞ্চি কৃতার্থ হয়ে গিয়ে জবাব দিয়েছে, আমার, উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠায় আপনার নামই মুদ্রিত থাকবে —

এখন সেই বিপদের দিন এসে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছে।

প্রেসের ম্যানেজার টেলিফোন করেছেন, লোক পাঠিয়েছেন এবং চিঠি দিয়েছেন যে, সমস্ত ফর্মা ছাপা হয়ে গেছে শুধু উৎসর্গ-পত্রের জন্য বইখানি আটকে আছে। কাল সকালে যেন উৎসর্গপত্র প্রেসে গিয়ে হাজির হয়, কেননা দুপুরের মধ্যেই দপ্তরী গিয়ে উপস্থিত হবে। বিকেলে একটা শুভযোগ আছে। প্রকাশকের নির্দেশ আছে - সেই শুভযোগের সময় বইখানি প্রকাশ করতে হবে।

তাই আজ গভীর রাত্রে নিশাচরের মত একা একা বিরিঞ্চি ছাদে পায়চারি করছে।

যদিই বা প্রকাশকের খোশামোদ করে একখানি বই তার প্রকাশিত হচ্ছে—কিন্তু এ কী ফ্যাসাদে পড়ল সে!

কোন সাহিত্যিকের জীবনে এ ঘটনা কি ঘটেছে কখনো? বহু জীবন-চরিত বিরিঞ্চি পাঠ করেছে—কিন্তু এ জাতীয় সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির কথা তার

জানা নেই!

একটার পর একটা সিগারেট পুড়তে লাগল বিরিঞ্চির মুখে—এ যেন পতঙ্গের আত্মাহুতি!

নিশীথরাতের তারার দিকে সে একবার তাকালো⋯কিন্তু তারা কোন হদিশই দিতে পারলে না!

মাথার ওপর কাল-পুরুষ ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ একটি আলেখ্য ভেসে উঠল বিরিঞ্চির মনে। একটি নারী মূর্তি⋯ধীরে ধীরে সেই নারী স্পষ্টতর হল। এ যে বিরিঞ্চিরই অর্ধাঙ্গিনী মণিকা।

মণিকার মুখে মৃদু হাসি। অঙ্গুলি নির্দেশ করে মণিকা কি বলতে চাইছে!

—হ্যাঁ, বিরিঞ্চি বুঝতে পেরেছে। অর্ধাঙ্গিনীর নামে সে যদি বইখানি উৎসর্গ না করে তবে তার বাপের বাড়ি থেকে মোটা টাকার মণিঅর্ডার আসা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে! সঙ্গে সঙ্গে যে ছবি ফুটে উঠল—তা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। বাড়িওলা, গ্যারেজের ভাড়া, মোটরের তেল, মুদি, ইন্সিওরেন্সের দালাল, স্যাঁকরা—সবাই এসে ভ্রূকুটি করে তার সামনে দাঁড়াল।

বুঝল, ওই মণিঅর্ডারের অভাবে তার সংসারটি একেবারে অচল হয়ে যাবে!

মণিকার ছবি মিলিয়ে যেতে করুণাময়ী করুণার মুখখানি ভেসে উঠল তার সামনে। করুণা কথা বলে না শুধু চোখের জল ফেলে!

আহা বেচারী! জীবনে তো তাকে পায় নি⋯শুধু বইখানি উৎসর্গ করবে—তাতেও এত কার্পণ্য?

করুণাকে সে বিমুখ করবে কি করে?

যখন পূজা সংখ্যার গল্পের ফরমাসের প্লাবন আসে—এই নতমুখী মেয়েটি সারা রাত জেগে তার রচনা নকল করে। ও যদি পেছন ফিরে বসে তবে এই পাইকারী অর্ডার সাপ্লাই দেবে কি করে? না, না,—করুণা তার ভাণ্ডারকে অক্ষয় করে রাখুক। তাঁকে ক্ষুণ্ণ করলে বিরিঞ্চির সাহিত্যিক-জীবন বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে!

ওকে সে ফেরাতে পারবে না কিছুতেই !

করুণার ছবি মিলিয়ে যেতেই—আলো ঝলমল স্টুডিও—দীপ্তিতে জ্বলে উঠল—সিনেমার তারকা বিদ্যুৎশিখার অপরূপ রূপ !

বিদ্যুৎশিখার ঠোঁটে ভুবন ভোলানো হাসি ! অঙ্গুলি নির্দেশে সে দেখিয়ে দিল - তার অনুরোধ রাখলে চিত্রজগতে অসামান্য সম্মান, সুযোগ, আর আশাতীত অর্থ লাভ !

কাগজে কাগজে তার নাম ছাপা হয়েছে কাহিনী রচয়িতা হিসেবে, সিনেমার কাগজগুলিতে তার ফটো ছাপা হয়েছে—নানা পোজে – বিবিধ ভঙ্গীতে !

সংবাদিকরা আসছেন তার 'ইণ্টারভিউ' নিতে। সে কখন ঘুম থেকে ওঠে, কি খায়, কোথায় যায়, কোন্ কলমে গল্প লেখে, কত রাত্তির পর্যন্ত জেগে বই পড়ে,—কি তার "হবি", কোন্ গাড়িতে সে বেড়াতে ভালোবাসে,—কোন্ মেয়ের সঙ্গে তার মন-দেওয়া-নেওয়া চলছে—এই সব কাহিনী অতিরঞ্জিত হয়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের অঙ্ক বেড়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে…ধাপে ধাপে, নানা সিনেমা প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরোধ আসছে নতুন গল্প দেবার জন্যে…!

সত্যি এ প্রলোভন সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না।

বিদ্যুৎশিখা তাকে অমরাবতীর সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

তাকে বিমুখ করলে বিরিঞ্চি নিজেই স্বর্গভ্রষ্ট হবে !

না—না—প্রাণ গেলেও সে তা পারবে না ! কিন্তু…মাণকার মণিঅর্ডার…!

করুণার কপি…!!

কিছুতেই মাথা ঠিক করতে পারে না বিরিঞ্চি !

পোড়া সিগারেট পাহাড় হয়ে উঠল।

বিরিঞ্চি কেবলি নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে আর পাগলের মত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে !

কি করে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে ?

নতুন বই বেরুবার সমস্ত আনন্দ যেন ওর মন থেকে উবে যাচ্ছে !

বিরিঞ্চি ছেলেবেলায় অনেক ধাঁধাঁর জবাব দিয়ে ছোটদের কাগজ থেকে পুরস্কার পেয়েছে! শক্ত অঙ্ক সমাধান করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় একশোর মধ্যে একশো নম্বর নিয়েছে!···আরো বড় হয়ে "ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল"-এর সমাধান করে মোটা টাকা পুরস্কারও লাভ করেছে···কিন্তু পুস্তক উৎসর্গের পাজ্‌ল্‌-এ তাকে এবার হিম্‌সিম্‌ খেতে হচ্ছে।

জীবনের এই জটিল-যুদ্ধে সে জয়লাভ করবে—না পরাজয়ের কলঙ্ক-তিলক ললাটে এঁকে নেবে?

ঠোঁট কামড়ে, কলমের ডগা চিবিয়ে, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে, পিঠ চুলকে, মাথার চুল ছিঁড়ে বিরিঞ্চি অস্থির হয়ে উঠল।

তার পরই অকস্মাৎ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে!

ইউরেকা! অঙ্কের ফল মিলে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর করে সে এই উৎসর্গপত্রটি রচনা করে ফেল্লে—

"প্রতি সাঁঝে—
সে সন্ধ্যা-তারার মতো—
এবং
প্রতি ঊষায় যে শুকতারার দ্যুতিতে—
আমার মনের-গগনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—
তাকে দিলাম!"

বার বার পড়ে নিজেই নিজের তারিফ করতে লাগল।

তিনটি সাপ মরল,—কিন্তু লাঠি ভাঙল না!

আঘটন —

দর্জিপাড়ার দল সদলবলে রওনা হয়েছে—কাঁচড়াপাড়ার দলের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ হবে। দর্জিপাড়ার দলপতি দোলগোবিন্দ আর কাঁচড়াপাড়ার কর্তা কানাইরাম পরস্পরের দীর্ঘকালের বন্ধু।

তাই কাঁচড়াপাড়া থেকে এসেছে এই 'মিতালী ম্যাচের' আহ্বান। ছেলে বেলায় ওরা এক ইস্কুলে পড়েছে তাই কলেজ জীবনে সখ্যতা আরো ঘনীভূত হয়েছে। যেন ঠিক দুধটুকু মরে ক্ষীর-টুকুতে এসে দাঁড়িয়েছে।

কথা আছে, আজ রাত্রে কাঁচড়াপাড়ার কানাইরামের গৃহে রাত্রিযাপন—মানে তার সঙ্গে বিরাট খ্যাট! আগামী কাল রোববার বিকেলে খেলা।

খেলা আর খাওয়া একসঙ্গে! তার মানে রথ দেখা আর কলা বেচা একই যাত্রায়। দর্জিপাড়ার দল সেইজন্যে সবাই উৎফুল্ল। কাল যদি গোল খেয়ে ফিরতে হয় তবে আজ রাত্তিরের রসগোল্লার প্রতি বীতরাগ হওয়া কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

একটা থার্ড ক্লাশের কামরায় সবাই বক্‌বক্ করে চলেছে। কলসী খালি থাকলেই জল ভরবার সময় শব্দ হয় বেশী!

হঠাৎ দলপতি দোলগোবিন্দের দৃষ্টি গেল কোণের একটি লোকের ওপর। অনেকগুলো বিয়ের টোপর এক সঙ্গে বেঁধে সে খোশমেজাজে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে। খবর নিয়ে জানা গেল, লোকটি টোপরের ব্যবসা করে। শ্রাবণ মাসে আজই বিয়ের শেষ তারিখ। তাই কলকাতা থেকে অনেকগুলি টোপর কিনে সে দেশে রওনা হয়েছে। এরপর ভাদ্র মাস মল-মাস, একেবারে ধু-ধু মরুভূমি! কোনো মিলন-যজ্ঞ সমাধা হবার জো নেই!

দোলগোবিন্দ সোল্লাসে সবাইকে জানিয়ে দিলে, দেখ ভাই, আমরা ফুটবলের দল—একেবারে বরযাত্রীর দলে রূপান্তরিত হয়ে যাই। একটি টোপর কিনে নিতেই হবে। লোকটির সঙ্গে ঝুলোঝুলি করে অনেক কষ্টে একটি টোপর সংগ্রহ করা গেল। এইবার প্রশ্ন উঠল, কাকে বর সাজানো যায়? দলের ভেতর নন্দের চেহারাটা অনেকটা নাড়ু-গোপালের মত। দোলগোবিন্দ বল্লে, নন্দকেই আমরা সবাই বর সাজিয়ে ফেলি। কেননা, নন্দের খুব বিয়ে করার শখ।

সঙ্গে সঙ্গে কারো স্যুটকেশ থেকে বেরুলো স্নো-পাউডার, কারো চকখড়ি, কারো গিলে করা পাঞ্জাবি আর কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি। শেয়ালদা থেকে রওনা হবার সময় দলের কাছ থেকে অনেকেই পেয়েছিল ফুলের মালা। সেইগুলি এক সঙ্গে জোগাড় করে বরমাল্য রচিত হ'ল। দীনেশ থিয়েটারে মেকআপ করে ভালো। সে চকখড়ি গুলে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চমৎকার করে বরের কপালে আর গালে কারুশিল্প এঁকে দিলে।

দোলগোবিন্দ নিজের পাম্পসু খুলে দিলে নন্দকে। আসল রাজার চাইতে যাত্রাদলের রাজাকে দেখায় ভালো। তাই নকল বর নন্দকেও তিল তিল করে তিলোত্তমা করে সাজিয়ে তোলা হ'ল। দর্জিপাড়ার দলের মুন্সীয়ানা দেখে গাড়িশুদ্ধ লোক ধন্যি ধন্যি করতে লাগল। ছেলেরাও সবাই হাফপ্যাণ্ট ছেড়ে এক-একটি বরযাত্রী সেজে আসর জাঁকিয়ে বসল।

কিন্তু শ্রাবণ-সন্ধ্যা সত্যি ছন্দপতন ঘটালো! কাচড়াপাড়া পৌঁছুবার আগেই সে কি ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি।

কোথায় ঘন-ঘন উলু দিয়ে কাঁচড়াপাড়া স্টেশন মুখরিত করে তুলবে, সবাইকে হকচকিয়ে দেবে দোলগোবিন্দের দল, তা নয় একেবারে বেড়াল-ভেজা হয়ে বেরুতে হবে!

বরকে সাজাবার জন্যে যে গিলে করা পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি বের করে দিয়েছিল তার মুখখানি দেখে মনে হ'ল বুঝি বা ফাঁসির হুকুমই হয়েছে ছেলেটির!

কাঁচড়াপাড়া প্ল্যাটফর্মে আরও তোড়ে নেমে এলো জল! গাড়ি ঘ্যাচাৎ করে থামতে কানাইরামের দলের টিকিটিও দেখা গেল না!

বর নন্দ বৃষ্টিধারাকে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সটান সকলের আগে নেমে গেছে মজা দেখাবার জন্যে…কেননা জামা, ধুতি, পাম্পসু কোনোটাই তার নিজের নয়, সবই পরস্মৈপদী !

প্ল্যাটফর্মে একেবারে লোক নেই বল্লেই চলে ! টিম্‌টিম্‌ করছে আলো, তাও বৃষ্টিধারায় রবার-ঘষা কাগজের মত ফ্যাকাশে।

এক রকম অন্ধকার দিয়েই ছুটছিল নন্দ…হঠাৎ দু পাশ থেকে দুজন লম্বা লোক এসে ওর দুটি হাত ধরে ফেলে বল্লে, এই যে বর এসে গেছে…আর আমাদের চিন্তা নেই !

থিয়েটারের অকস্মাৎ নৈশ আক্রমণের মত নন্দকে ওরা দুজন সত্যি একেবারে হক্‌চকিয়ে দিলে !

নন্দ চোখ কপালে তুলে, কোনোরকমে ঢোক গিলে বল্লে, আমি বর নই—সেণ্টার ফরোয়ার্ড—

—Then forward ! Quick march !

লোক দুটি নন্দকে সযত্নে ধরে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে এলো। বৃষ্টির ভয়ে টিকিট-চেকারও রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল না ! নইলে তার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করা যেত !

বাইরে অন্ধকার গাছতলায় ঘোড়ার গাড়ি তৈরী। নন্দ কলেজের ছেলে—ভাবলে শ্রাদ্ধ কদ্দুর গড়ায় একবার দেখাই যাক্ না !

ওরা তিনজনে গাড়িতে উঠতেই ঝড়-বৃষ্টির মাঝখান দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটে চল্লো। শুধু কানে এসে ধাক্কা দিতে লাগল একটানা শব্দ খট্‌ খট্‌ খট্‌ !

বৃষ্টিরও বিরাম নেই—পথেরও শেষ নেই।

কোথায় যেতে হবে, কদ্দুর যেতে হবে, নন্দ কিচ্ছু জানে না। বন্ধুর দল থেকে ছটকে এসে যে বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি সে কথা এখন বেশ বুঝতে পারে। এক একবার মুখ তুলে প্রশ্ন করতে যায়, কিন্তু গাড়ির ভেতরকার অন্ধকারের মধ্যে দু জোড়া চোখ জ্বলতে থাকে। নন্দ মাথা নীচু করে নেয়, কোন কিছু জিজ্ঞেস করা আর হয়ে ওঠে না।

কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধ্বনি, আর ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌ শব্দ! আবার মনে হয় খট্‌খট্‌ আওয়াজটা তার বুকের ভেতর থেকেই শোনা যাচ্ছে!

পথের দু পাশ থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক তাকে কোন মতেই ভরসা দিতে পারে না।

মনে হয় বৃষ্টি-ভেজা গাছগুলির ফাঁক দিয়ে ড্যাবডেবে চোখ মেলে কারা যেন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই নৈশ অভিযান দেখছে!

ঘোড়ার খুরের শব্দ আরো কঠিন হয়ে কানে বাজে।

গাড়ি দ্রুত বেগে এগিয়ে চলে· অন্ধকারের অভ্যন্তরে। অবশেষে একসময় এসে গাড়িটি একটি বাড়ির সামনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে তার যাত্রা শেষ ঘোষণা করলে।

মিটমিটে লণ্ঠন হাতে নিয়ে একটি লোক চাদরে মুখ ঢেকে এসে দাঁড়াল। তারই ক্ষীণ আলো খানিকটা এসে পথের ওপর পড়েছিল। নিঃশব্দে দুটি ঢ্যাঙা লোক নন্দর হাত ধরে তাকে দোতলার ওপর তুলে নিয়ে গেল।

বিয়ে বাড়ি কিন্তু আলোর রোশনাই কোথাও নেই। যেন একটা সবুজ আভা ঘষা কাঁচের ওপর থম্‌থমে হয়ে আটকে আছে। কোনো গভীর পুকুরে স্নান করতে ডুব দিয়ে চোখ মেলে তাকালে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি!

জানালার ওধারে, দেয়ালের কোণে, দরজার ফাঁকে কারা যেন ফিস্‌ ফিস্‌ করে পরামর্শ করছে! তাদের কথার আভাস ভেসে আসে, কিন্তু চোখে দেখা যায় না।

নন্দ অনেক কথা এক সঙ্গে বলতে চাইছে। বুকের ভেতর থেকে গলা অবধি বুদ্‌বুদের মত কি সব ঠেলে উঠছে···কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ করে কিছুই বেরুতে পারছে না!

আপন মনে ভাবছে, কি কুক্ষণেই দোলগোবিন্দ টোপরওয়ালাকে ট্রেনের কামরায় আবিষ্কার করেছিল তারই মাশুল গুনতে হচ্ছে ওকে! টোপর মাথায় না থাকলে তো আজ এই শনিবারের বারবেলায় অন্ধকারের আবছাতে তাকে এই ফ্যাসাদে পড়তে হ'ত না!

বিয়ের সব ব্যবস্থা তৈরীই ছিল।

আবলুস্ কাঠের মত কালো, শীর্ণদেহ—তারই ওপর সাদা ধবধবে পৈতে ঝোলানো এক পুরোহিত কাঁচের মত চোখ নিয়ে ক্রমাগত তার দিকে তাকাতে লাগল! বলির আগে 'উচ্ছুগ্যো' করা ছাগ-নন্দনের দিকে যেমন করে খাঁড়াধারী চায় ঠিক তেমনি তীব্র তার চাউনি!

হঠাং ঘন ঘন শাঁখ বেজে উঠল। সেই সঙ্গে শোনা গেল, একটা বেড়ালের কুৎসিৎ ম্যাও ম্যাও ডাক আর কালপ্যাঁচার কর্কশ চীৎকার!

নন্দ ঠিক বুঝতে পারলে না—এ বিয়ের বাসর না শ্মাশান-যাত্রা! টোপরটা মাথা থেকে ছুঁড়ে ফেলতে চাইলে, কিন্তু সেটা যেন আঠা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে! মাথাটা ভয়ানক ভারী বলে মনে হ'ল। হাত দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে! নাকের ডগায় মাছি বসলেও এখন সে তাকে তাড়াতে পারবে না।

ইতিমধ্যে তাকিয়ে দেখলে চারটি লম্বা জোয়ান লোক একটি পিঁড়ির ওপর কনেকে বসিয়ে বিয়ের আল্পনা দেওয়া জায়গায় নিয়ে এলো। ওকেও একটা বাঁশ ধরে দাঁড়াতে হ'ল!

এক-এক বার মনে হল—এই বাঁশটা তুলে নিয়ে কারো মাথায় মারলে হয় না? কিন্তু হাত দুটো ওর অসাড, কিছুই করবার জো নেই!

একটা বাদুড় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমাগত ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল নন্দ। সব সময়ই মনে হতে লাগল, বাদুড়টা মাথার ওপর একটা ঝাপটা মারবে!

শুভ-দৃষ্টির সময় কে একটা চাদর ফেলে দিলে ওর আর কনের মাথার ওপর। হঠাং দেখা গেল সেই বাদুড়টা চাদরের তলায় ঢুকে গেছে। বাদুড়ের পাখার ঝাপটে কনের ঘোম্টাটা সরে যেতে নন্দ শিউরে উঠে দেখলে, একটা মড়ার খুলি দাঁত বের করে তার দিকে চেয়ে খিল্‌খিল্ করে হাস্‌ছে!

নন্দর কিন্তু নডবার ক্ষমতা ছিল না। আশেপাশে ফিস ফিস কথা—মালা বদল করো—চোখ মেলে চাও!

পাথরের হাত কিসের জোরে আপনা থেকেই উঠে গেল; ওরা পরস্পর

মালা বদল করলে।

কনের হাতের হাড়ের ওপরকার গয়নাগুলি ঝম্ ঝম্ করে বেজে উঠল।

সম্প্রদানের সময় কনের হাত যখন বরের হাতের ওপর এসে পড়ল একটা তুহিন শীতল স্রোত সারা দেহের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে বয়ে চলে গেল।

কি ভাবে যে বিয়ে শেষ হ'ল, সাত পাক ঘোরা হ'ল, যজ্ঞ সমাধা হ'ল, নন্দ কিছু বলতে পারে না। অভিভূতের মত আশপাশের ফিস্‌ফিস্ কথাতে সে শুধু অনুরোধ পালন করে চলেছে।

এক সময় তাকিয়ে দেখলে নতুন কনের সঙ্গে বাসরঘরে সে বসে আছে। বসে আছে তারা দুটিতে, কিন্তু মনে হ'ল ওরা একলা নয়। এদিকে ওদিকে এয়োরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের শাড়ীর খস্ খস্ আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। ওদের খোঁপায় যে বেলফুলের গোড়ে জড়ানো আছে তারই তীব্র সুমিষ্ট গন্ধ নন্দকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। তা ছাড়া জানালার ফাঁক দিয়ে কারা যেন আকুল আগ্রহে বড বড চোখ মেলে বর-কনেকে দেখছে। নন্দ যেদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়—তেমনি অসংখ্য চোখ ভেসে ওঠে। ঠিক মানুষের চোখ নয়, সে চোখে পলক পড়ে না—কাঁচের চোখ, কিন্তু কি কথা বলতে চায় সেই ঘষা চোখগুলি নন্দ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না!

হঠাৎ কনে উঠে দাঁড়াল তার পাশ থেকে। সামনে লম্বা বারান্দা—সেই দিকে এগিয়ে গেল সে—আর তার পায়ের মল ঝম্ ঝম্ করে বাজতে লাগল। বারান্দার আর এক প্রান্তে নীচে নামবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির কাছে পৌঁছে কনে হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালো বরের দিকে। লাল চেলির তলা থেকে শীর্ণ হাতখানি তুলে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। হাতগুলো খট্ খট্ করে আওয়াজ তুল্লো; আর সেই সঙ্গে শোনা গেল গয়নার টুংটাং শব্দ।

বনের মধ্যে সাপ যেমন করে হরিণকে চোখের চাউনিতে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি নন্দকে কে যেন আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে লাগল। ঝম্ ঝম্ করে বাজছে হাড়ের ওপর চুড়ি, বালা, হার, অনন্ত, মল আর মাকড়ি, আর সেই শব্দকে অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে নন্দ।

দূরে একটা পাতকুয়ো দেখা গেল। তার ওপরে ছায়া ফেলেছে ন্যাওড়া গাছ।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ক্ষীণচাঁদের আলো এসে পড়েছে কনের সিঁথি-মৌরের ওপর, চেলির জরির আঁচলে, সোনার গয়নাগুলির মাথায় মাথায়।

কনে এগিয়ে চলেছে দ্রুত পদে সেই পাতকুয়োর দিকে। ঝম্ ঝম্ শব্দে সে পাতকুয়োর মধ্যে নেমে গেল। নীচে মিলিয়ে যাবার আগে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকলে নন্দকে।

নন্দও ছুটে চলেছিল ওই দিকে।

হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে ঐখানেই পড়ে গেল। আশপাশের অন্ধকার ঝোপে-ঝাড়ে যেখানে লাখো লাখো জোনাকি জ্বলছিল আর নিভছিল —সেইখানে কারা যেন আচম্‌কা খল্ খল্ করে হেসে উঠল!

নন্দ কখন জ্ঞান হারালো সেকথা কেউ জানে না!

খুব ভোরে কতকগুলি লোকের কথা-বার্তায় নন্দর জ্ঞান ফিরে এলো। সে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকালো।

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে!

স্বপ্ন কি সত্য ভালো করে ঠাহর করতে পারছে না! দেখলে সে একটা পোড়ো বাড়ির রোয়াকে শুয়ে আছে। আদ্দির জামা আর শান্তিপুরের ধুতি একেবারে কাদায় মাখামাখি!

টোপরটা কিন্তু ঠিক আটকানো আছে, ওটা খুলে পড়ে যায়নি!

ওই পাড়ার হলধর খুড়ো ওকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে দু-পা এগিয়ে এসে বল্লেন, যাক, বাপ-মার খুব সুকৃতিতে বেঁচে গিয়েছ তুমি! আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে উল্টোটাই ভাবছিলাম।

ক্ষীণ কণ্ঠে নন্দ শুধোল, এ কোথায় এসে পড়েছি আমি? কিছুতেই তো মনে পড়ছে না!

থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন ভটচাজ মশাই। তিনি বল্লেন, সে এক

কাহিনী ভায়া, দশ বছর আগে এই বাড়িতে খুব ধুমধাম করে এক জমিদারের মেয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু কনেটি সেই রাত্রিতেই কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সেই থেকে প্রতি শ্রাবণ সংক্রান্তিতে একটি বরকে কারা রাত্তিরের অন্ধকারে ধরে নিয়ে আসে, আর সকাল বেলা তার প্রাণহীন দেহটাই খুঁজে পাওয়া যায়। বাপ-মার বহু পুণ্যির ফলে তুমি রক্ষা পেয়েছ দেখছি! দুর্গা দুর্গা!

তামাক টানতে টানতে ভটচাজ মশাই নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

নন্দর মগজে আবছা আবছা ছবি ভেসে উঠল।

ভয়ে ভয়ে শুধোলে, রাত্তিরের অন্ধকারে যাদের দেখলাম, তারা? হলধর খুড়ো বল্লেন, দিনের বেলা আর তাদের চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তোমাকে বাবাজী কোত্থেকে এরা ধরে এনেছে?

এমন সময় কাঁচড়াপাড়ার কানাইরামের সঙ্গে দোলগোবিন্দের দল এসে হাজির! বল্লে, সারারাত ধরে তোকে গরু-খোঁজা করেছি নন্দ! কোথায় হঠাৎ পালিয়ে গেলি বল তো?

হলধর খুড়োর কাছে রাত্তিরের কাহিনী শুনে হো-হো করে হেসে উঠল দোলগোবিন্দ।

বল্লে, ওই সব আজগুবি কথা বিশ্বাস করব ভেবেছেন! তারপর গলা খাটো করে মুখটা ওঁর কানের কাছে এগিয়ে নিয়ে উত্তর দিলে, আসল কথাটা কি জানেন? কাল সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে নন্দ দু গেলাস সিদ্ধি ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে এসেছিল! তখন কত মানা করেছিলাম! এ তারই ফল।

তারপর নন্দর দিকে তাকিয়ে বল্লে, চল্, তোর বাসর ঘরের 'খোয়ার' আমি ভাঙছি! স্রেফ দু বাটি তেঁতুল গোলা জল গিলতে হবে। একেবারে অব্যর্থ ওষুধ!

অবশেষে রামকানাইয়ের একটা আশ্রয় জুটে গেল।

ওরই পিসতুতো ভাই অমলেশ কলকাতার সওদাগরী অফিসে চাকরি করে আর সামান্য মাইনেতে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায়। রামকানাইকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর একটা খণ্ড বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেছে।

—বলে, আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে!

ভুরু কুঁচকে সৌদামিনী মন্তব্য করে।

অমলেশ ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে বৌকে থামতে ইঙ্গিত করে। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলে, আরে, তুমি বুঝতে পারছ না! কষ্টের সংসারেই তো সব সময় একটি বাড়তি লোকের দরকার। এই ধরো না কেন, সকালে বিকালে দুটো টিউশনি করে অফিস ঠেঙিয়ে আর কতটুকু সময় পাই বলো? তাই তোমার সংসারের বাজার করা, রেশন আনা, পুঁটুকে সময়ে অসময়ে একটু আধটু পড়ানো—কেমন বিনে পয়সায় চলে যাবে সেটা ভেবে দেখছ? কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। একজনের ভাত ওরই ভেতর থেকে দিব্যি হয়ে যাবে।

সৌদামিনী চোখ ঘুরিয়ে জবাব দেয়, হুঁ! তুমি যা ভাবছ তা মোটেই নয়। তোমার লক্ষ্মণ ভাই ভাত খায় এই এক কাঁড়ি!

দু হাত দিয়ে একটা পরিমাণ দেখাতে চেষ্টা করে সৌদামিনী।

—একেবারে যাকে বলে বেড়াল ডিঙুতে পারে না!

অমলেশ উত্তর দেয়, আরে চেপে যাও না। আমি ওরও একটা চাকরির চেষ্টা করছি আমাদের অফিসে। যদি কোন রকমে জুটিয়ে দিতে পারি তো আমাদের সংসারেরই তো সাশ্রয় হবে।

এইবার সৌদামিনীর মুখে হাসি ফোটে।

পান দোক্তা খাওয়া বত্রিশটি কালো দাঁত বিকশিত করে বলে, হ্যাঁ, তাহলে সংসারের একটা সুরাহা হয়। ঠাকুরপোর চাকরি হলেই কিন্তু আমি দিন-রাতের একটি ঝি রেখে দেব।

অমলেশ রসিকতা করতে ছাড়ে না।

—অমনি ঠাকুরপোর ওপর দরদ উথলে উঠল! তুমি রামকানাইকে 'বাউণ্ডুলে' ছাড়া তো ডাকতে না! একেবারে চাকরির নামে ঠাকুরপোর পদবীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেল!

সৌদামিনী কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে, না-না, সে কথা নয়, মানে আমি তা বলি নি। দু ভায়ের মাইনের টাকা এক সঙ্গে হলে সংসারটা ভালো ভাবে চালানো যায় আমি শুধু তাই ভাবছিলাম।

—বেশ বেশ। বলে আর কথা না বাড়িয়ে অমলেশ টিউশানিটাকে বজায় রাখবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে।

সেদিন খেতে বসে রামকানাই একটু হকচকিয়ে যায়। অন্যান্য দিন থালার ওপর ভাত থাকে অনেকটা চাকরের মত—মাঝখানে স্তূপ করা আর তারই মধ্যিখানে গর্ত খুঁড়ে ডাল বাসা বাঁধে!

আজ ডাল আর ভাতের মধ্যে লুকিয়ে নেই—স্থান পেয়েছে আলাদা কলাই-বাটির ভেতর। ভাতও দিব্যি পরিপাটি করে নৈবিদ্যির মত সাজানো। নুনের পাশে আবার ছোট একফালি লেবু।

রামকানাই অবাক হয়ে সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুধোয়, এ সব কি ব্যাপার বৌদি?

বৌদির মুখে-চোখে আজ মমতা উছলে পড়ে।

উত্তর দেয়, না না, দিন রাত আমার সংসারের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করছ। সময়মত একটু ভালো করে খাওয়া-দাওয়া না করলে ব্যাটাছেলের শরীর টিকবে কেন? নাও, ভালো হয়ে বসে খাও।

অসীম ঔদার্যে সৌদামিনী স্বামীর পিঁড়িটা এই প্রথম দেবরকে পেতে দেয়।

একেবারে সরাসরি ফাঁসির হুকুম হয়েছে কিনা রামকানাই বুঝতে পারে

না। তবু পেটে আগুন জ্বলছে এ কথা তো আর মিথ্যে নয়। তাই আর কথা কাটাকাটি না করে আসল কাজে মন দেয়।

পরে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবেচিন্তে দেখলেই চলবে। সূর্য আজ কোন্ দিক থেকে উঠেছে সে খবরটাও তো নিতে হবে।

এর দিন দুয়েক পরের ঘটনা।

সৌদামিনী কোমরে আঁচল জড়িয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে এলো।

—ঠাকুরপো দিন রাত তোমার সংসারে আর মুখে ফ্যানা তুলে খাটতে পারে না।

জিজ্ঞাসু নেত্রে অমলেশ বৌয়ের দিকে তাকায়।

—কেন, কি হ'ল আবার?

সৌদামিনী উত্তর দিলে, ঠাকুরপোকে আজ সঙ্গে করে তোমার অফিসে নিয়ে যাও। বড় সাহেবকে বলে দেখ, যদি একটা চাকরি হয়। এই ভাবে রোজ বাজার করে আর র‍্যাশন এনেই কি ওর জীবন যাবে নাকি? আমি বৌদি, ওর ভবিষ্যতের কথাটাও তো ভাবতে হবে আমাকে!

সৌদামিনীর মুখের কথা শুনে অমলেশও বেশ হকচকিয়ে যায়!

এমন ভাবে ওর বৌ কথা বলে যেন প্রস্তাবটা আগাগোড়া ওরই—দ্যাওরের জন্যে রাত্তিরে সৌদামিনীর ঘুম হচ্ছে না!

অমলেশ বলে, তা মন্দ কি? আচ্ছা, আজই নিয়ে যাবো'খন আমাদের অফিসে। ওরে রামকানাই, তুই তৈরী হয়ে নে। দেখি আমাদের বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলে—তোর একটা গতি হয় কিনা!

রান্নাঘরে দুই ভায়ের জন্যে ভাত বাড়তে বাড়তে মুখঝামটা দিয়ে সৌদামিনী ফোঁড়ন কাটে, অমন ঠেলা-মারা কথা বললে তো চলবে না। যে করে হোক ঠাকুরপোর একটা ভালো চাকরি জুটিয়ে দিতেই হবে। তার পর রাঙা টুকটুকে একটি বৌ আনব ঘরে। আমার সঙ্গে ঘুর্‌ঘুর্ করে কাজ করবে, আলতা পায়ে উঠোনে ঘুরে বেড়াবে—কেমন দেখতে হবে বলো তো?

অস্ফুট স্বরে অমলেশ জবাব দেয়, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল!

সৌদামিনী সেটা শুনতে পায় কিনা বোঝা যায় না।

অমলেশ সেদিন সত্যি রামকানাইকে সঙ্গে করে আফিসে যায় আর বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে নিজের অভিলাস জ্ঞাপন করে।

বড়বাবু অমলেশকে একটু স্নেহ করেন। সেটা তার কথা শুনেই বোঝা গেল। কেননা বড়বাবুর চেয়ারের সাধারণ রীতি অনুসারে খ্যাক খ্যাক করেও উঠলেন না, আর প্রস্তাবটাকে সরাসরি বাতিলও করে দিলেন না। বরং হাসিমুখে ঘাড় কাৎ করে আশ্বাস দিলেন যে, 'ভেকেন্সি' হলেই অমলেশের ভাই রামকানাই 'চান্স' পাবে।

মনে মনে একটা আকাশ-কুসুম রচনা করে আর দাদার টিফিনের ভাগ নিয়ে পান চিবুতে চিবুতে রামকানাই বাড়ি ফিরে এলো।

সৌদামিনী রসিকতা করে বললে, কি ঠাকুরপো, রাঙা টুকটুকে বৌয়ের নামেই যে একেবারে ঠোঁট রাঙা করে ঘরে ফিরলে? সত্যি সে ঘরে এলে না জানি কি হয়!

রামকানাই আজকাল বৌদির খুব বাধ্যের। যাকে বলে একেবারে সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর। মাথা চুলকে উত্তর দিলে, কি যে তুমি বলো বৌদি তার ঠিক নেই! টিফিন খাওয়ালে, পান খাওয়ালে—তাই না তুমি এসব কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছ!

সৌদামিনী তবু মুখ টিপে ফোঁড়ন দিতে ছাড়ে না। বললে, তা তোমারও দুঃখু থাকবে না ঠাকুরপো, আমার ছোট জাটি এলে সেও সুন্দর করে টিফিনের বাক্স সাজিয়ে দেবে, পান সেজে দেবে। সব আমি শিখিয়ে পড়িয়ে দেব, এতটুকু ক্ষোভ রাখব না তোমার।

রামকানাই হাসতে হাসতে রাস্তায় নেমে যায়। তারপর আপন মনে একটি বিড়ি ধরিয়ে ক্রমাগত ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।

সেদিন রাত্তিরে ঠারে-ঠোরে কথা চলে কর্তা-গিন্নির। অমলেশ প্রথমে শুরু করে—কি গো, আজকাল হ্যাওরের আদর-যত্ন খুব যে বেড়েছে! বাউণ্ডুলের এই

পদোন্নতির কারণ কি শুনি ?

সৌদামিনীও কম যায় না ; মুখটা ঘুরিয়ে চোখের কোণে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিয়ে উত্তর দেয়, তা যে গরু দুধ দেয় তার চাট্ সইতে হবে বৈকি !

– বটে ! বটে ! বটে ! তা হ'লে সার কথা বুঝে নিয়েছ এরই মধ্যে ? তবু তো এখনো চাকরিটা জোটে নি ! মাথা দুলিয়ে বলে অমলেশ ।

—তোমাদের বড়বাবু যখন কথা দিয়েছেন তখন আর চাকরি জুটতে বাকি কি ? বড়বাবু তোমায় বেশ একটু খাতির করেন, কি বলো ?

জিজ্ঞাসু নেত্রে সৌদামিনী শুধোয় । অমলেশ উত্তর করে, খাতির আমি সবাইকার কাছ থেকেই পাই । শুধু তোমারই মন পাই নে এই যা !

মরণ আর কি ! বলে মুখ বেঁকিয়ে সৌদামিনী রান্নাঘরের দিকে চলে যায় ।

রামকানাই এখন বেশ আদরে গোবরে কাল কাটাচ্ছে । সৌদামিনী প্রায়ই বলে, ঠাকুরপো, এই ডালনাটা শুধু তোমার জন্যে আলাদা করে রেঁধেছি, দেখ তো কেমন হয়েছে ? কিম্বা বলে, তোমার গেঞ্জিটা সাবান দিয়ে রেখেছি । এত নোংরা গেঞ্জি পরে বেরোও কি করে ? অথবা বলে, তোমার ছেঁড়া গামছাটা ন্যাতা করে নিয়েছি ঠাকুরপো । না-না, চোখ অমন কপালের ওপর তুলো না । একটা নতুন গামছা ফিরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে রেখেছি । ওই দেখ, দড়িতে টাঙানো আছে ।

রামকানাই চোখ বুজে পান চিবোয় আর মনে মনে ভাবে, চাকরি না হতেই এই, চাকরি পাওয়ার পর বৌদি বোধ করি ওর হাতে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তুলে দেবে !

মাঝে মাঝে সে বৌদির তাগিদে দাদার অফিসে যায় আর বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসে । সৌদামিনীর দৃষ্টি সব দিকে সমান । দেওর যাবার সময় নানা রকম খাবার করে ওর হাতে তুলে দেয় । বড়বাবুকে খাওয়াতে হবে ; মুখমিষ্টি না হলে আসল কাজের কথা মনে থাকবে কেন ? কিন্তু এরই মধ্যে এমন একটা বেমক্কা কাণ্ড ঘটল যে সৌদামিনীর সব প্ল্যান ওলট-পালট হয়ে গেল ।

অমলেশ গিয়েছিল ফুটবল খেলা দেখতে। একেবারে ভিজে কাকটির মত বাসায় ফিরে এলো।

সৌদামিনী মাথার জল মুছিয়ে দিলে, পায়ে কালোজিরে-ফোটানো গরম সরষের তেল মালিশ করলে, রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে আদা-চা তৈরী করে এনে খাওয়ালে, কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। সারারাত ধরে চলল—হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, তারপর শেষ রাত্তিরে কম্প দিয়ে এলো জ্বর।

পরদিনই ডাক্তার ডাকা হ'ল। তিনি বুকের যন্ত্র নিয়ে বুক দেখলেন, পিঠ দেখলেন; দুধারের পাঁজর ঠুকে ঠুকে কি যেন বুঝতে চাইলেন। লাল চোখ দুটোকে বারে বারে খুলে কি পরীক্ষা করলেন, জ্বর নেবার কাঠি দিয়ে দু'বার তাপ দেখলেন, তারপর মুখখানি বাঁকা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রামকানাই শুধোলে, কি রকম বুঝছেন ডাক্তারবাবু? ডাক্তারবাবু চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে উত্তর দিলেন, চিকিৎসা করতে হবে ভালো করে। তোমার বৌদিকে সে কথাটা জানিয়ে দাও।

সৌদামিনী প্রথমটা হাসবে কি কাঁদবে ভালো করে ঠাহর করতে পারল না। তারপর পাথরের মূর্তির মত ঘরের দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তারবাবু আবার বললেন, নতুন ধরণের ইন্‌জেক্‌সন বেরিয়েছে, তার অনেক খরচ।

রামকানাই সৌদামিনীর কাছে এগিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন বৌদি? তোমার গয়নাগুলো বের করে দাও না—

সৌদামিনী আঁতকে উঠে ভুরু কুঁচকে তার লক্ষ্মণ দেওরের দিকে তাকায়।

রামকানাই ওকে আশ্বাস দিয়ে উত্তর দেয়, না-না, তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না বৌদি! এখন গয়নাগুলি বের করে দাও। আমি বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে আসি। দাদার চিকিৎসা তো কোন মতেই বন্ধ থাকতে পারে না। চাকরি পেয়ে সমস্ত গয়না আমি ফেরত নিয়ে আসব।

এর পর আর কোন কথাটি বলা চলে না। মোহগ্রস্ত মানুষের মত সৌদামিনী গয়নাগুলি বের করে এনে রামকানাইয়ের হাতে তুলে দেয়।

তারপর এলো ওষুধ, এলো পথ্যি, এলো রকমারি ফল, আর দেওয়া হ'ল ইন্‌জেক্‌শনের দাম আর ডাক্তারের ভিজিট।

দুপুরের একটু বাদে অমলেশের ওরই মধ্যে যেন একটু জ্ঞান হ'ল। চারিদিকে পাগলের মত তাকাতে লাগল সে।

সৌদামিনী শুধোয়, কি চাই তোমার?

অমলেশ ক্ষীণ কণ্ঠে ব'লে, রামকানাই--

রামকানাই ছুটে এলো। অমলেশ বললে, ছুটির দরখাস্ত করতে হবে। চাকরীটা তো বাঁচাতে হবে। তুই লিখে ফেল্—পনের দিনের ছুটি চাই!

রানকানাই দাদার আদেশ পালন করলে। তারপর সেই দরখাস্ত নিয়ে রওনা হ'ল ওর অফিসে। পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা।

রামকানাই শুধোয়, ডাক্তারবাবু, দাদা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠবে তো?

ডাক্তার ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দেয়, আজকের রাত্তিরটা কাটলে হয়!

রামকানাইয়ের মাথায় প্ল্যান জাগে। সে ছুটে যায় দাদার আফিসে। সরাসরি গিয়ে বড়বাবুর কামরায় ঢোকে। ভাগ্যি ভালো, উনি একাই রয়েছেন ঘরে।

রামকানাই বলে, দাদার বড্ড বাড়াবাড়ি অসুখ বড়বাবু, এই ছুটির দরখাস্ত। বলে মাথা চুলকোতে থাকে!

বড়বাবু বলেন, কি বলতে চাও বলো না।

রামকানাই আর একবার ঢোঁক গিলে উত্তর দেয়, আজ্ঞে, দাদার ছুটির দরখাস্ত বটে…তবে আমি বলি কি…ও চাকরিটা আমাকেই দিয়ে দিন—

তার মানে? গর্জে ওঠেন বড়বাবু!

—আজ্ঞে, ডাক্তার বললে, আজকের রাত্তিরেই উনি টেঁসে যাবেন! মানে ভেকেন্সি হবে—সেই কথাটাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি!

মীনুর সঙ্গে তাঁর সহপাঠিনী চন্দ্রার প্রায়ই গোপন কথা হয়ে থাকে।

এতে তাদের কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। কেননা দুজনেরই জীবনে গোপন কথা বলার সময় এসে গেছে।

আশুতোষ কলেজের আই. এ. ক্লাশে উভয়েই এক সঙ্গে পড়াশোনা করে। কাছাকাছি ওদের বাসা, সেই জন্যে কলেজে আসা-যাওয়াটাও একই সঙ্গে গল্প করতে করতে হয়ে থাকে। এতে মুখরোচক আলোচনাও চলে, আর ট্রাম-বাসের পয়সাটাও বেঁচে যায়।

মীনু একদিন জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ রে চন্দ্রা, আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বলত, তোর কি রকম বর পছন্দ ?

চন্দ্রা এমনভাবে রাস্তার মাঝখানে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে যে আশপাশের লোক চমকে যায়!

মীনু ওর কাণ্ড দেখে চটে ওঠে!

—আচ্ছা চন্দ্রা, তোর হ'ল কি বল তো ? যে কথা কানে কানে বলবার সেই ব্যাপারে তুই একটা সিন্ ক্রিয়েট্ করছিস ?

চন্দ্রা এইবার মুখ টিপে হাসতে থাকে। জবাব দেয়, তা তুই হাটের মাঝে জিজ্ঞেস করলে লাফটার সৃষ্টি হবেই! স্থানকালপত্র বুঝে প্রশ্ন করবি তো ?

মীনু মাথা নাড়তে থাকে। হ্যাঁ, সে কথা অবশ্যি সত্যি।

তারপর আবার আগ্রহের আতিশয্যে গলা খাটো করে শুধোয়, আচ্ছা, বল না একটু তোর মতামতটা ?

চন্দ্রা আড চোখে একবার সখির দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, তবে নেহাতই শুন্‌বি ? আচ্ছা, শোন! আমাদের যে বয়েস সে সময় একদল দাদা এসে

জুটবেই! পাড়াতুতো দাদা, বৌদির ভাই দাদা, দাদার বন্ধু দাদা, সখির ভাই দাদা, পাশের বাড়ির নতুন বৌটির ভাই দাদা, এইভাবে একদল মাছি সব সময় তোর কানের আশে-পাশে ভ্যান্ ভ্যান্ করতেই থাকবে। আর তা যদি না করে বুঝবি যে তোর নিজস্ব কোন 'গ্ল্যামার' নেই!

মীনু সখীর বিশ্লেষণ শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, খুব দূরদৃষ্টি আছে তো তোর চন্দ্রা! মনের কথাটা একেবারে খুলে বলেছিস! এখন কি করা যায় বল তে?

অবাক হয়ে চন্দ্রা জিজ্ঞেস করে, কিসের কি?

মীনু বিরক্তির স্বরে উত্তর দেয়—এইসব পাড়াতুতো দাদাদের হাত থেকে কি ভাবে নিস্তার পাওয়া যায়?

আশপাশের লোকজনদের ভুলে গিয়ে আবার খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে চন্দ্রা।

—ও! তাহলে তোকেও ভ্যান্-ভ্যান্ সহ্য করতে হচ্ছে বল্! কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞেস করে চন্দ্রা।

মীনু এইবার সত্যি মুখ গম্ভীর করে তোলে।

—সহ্য আবার করতে হচ্ছে না? তুই যেমন যেমন বল্লি ঠিক তাই! কেউ মেয়েদের মত বড় বড় চুল দুলিয়ে বলবে, নতুন ছন্দে কবিতা রচনা করেছি, শুনবে না মীনু? কেউ একটা গাড়ি নিয়ে সন্ধ্যেবেলা এসে হাজির হবে, কইবে, মেট্রোতে দুখানি টিকিট কিনেছি—একেবারে পাশাপাশি! অনবদ্য অভিনব ছবি, 'লাভলি টু লুক এ্যাট্'—চলো না লক্ষ্মীটি!

কেউ বা বলবে, মুর্শিদাবাদ সিল্ক হাউসে নতুন প্যাটার্নের শাড়ী দেখে এলাম। চলো, তুমি নিজে পছন্দ করে হাতে তুলে নেবে—তবেই আমার অর্থ সার্থক হবে।

আর একজন আসে বড়দির ননদের কি যেন হয়, একেবারে মুখচোরা মানুষ, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকবে। এতটুকু আলস্যি বা কুণ্ঠা বোধ নেই! যেই দেখবে লোকজনের ভিড়

নেই, আমি একলাটি, অমনি ল্যাপ ডগের মত ল্যাজ নেড়ে বলবে, তোমার সঙ্গে যে আমার একটি গোপন কথা ছিল মীনু, এখন কি শোনবার সময় হবে? চলো না, একটু ছাদে যাই…!

—আচ্ছা বলতে পারিস চন্দ্রা, এদের হাত থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায়?

চন্দ্রা মিটি-মিটি হাসতে থাকে।

সত্যি, এই সময় তাকে ভারী সুন্দর দেখায়। মীনু ঠাট্টা করে বলে, এই হাসি দেখলে আমি অবধি পাগল হয়ে যাই—তা পুরুষ মানুষের কি দোষ দেব বল্?

চন্দ্রা ওকে ধাক্কা মেরে উত্তর দেয়, ছাই হাসি! কিন্তু তোর চোখ দুটিই যে সর্বনাশের মূল মীনু! যারা আশেপাশে এসে দিন-রাত্রি ভ্যান্-ভ্যান্ করে, তাদের দোষ দিতে পারি নে! ব্যাটাছেলে হলে আমিও যে তাই করতুম!

মীনু এইবার হেসে ওঠে। বলে, তা হলে কিন্তু তোর গলায় আমি মালা ঝুলিয়ে দিতাম!

—কোন্ মার্কেটের মালা কিন্‌তিস্ আমায় বল্ না ভাই! সকৌতুকে জিজ্ঞেস করে চন্দ্রা।

এইভাবে গল্প করতে করতে ওরা কলেজের গেট অবধি উপস্থিত হ'ল। কাজেই শেষ পর্যন্ত সমস্যার কোন সমাধান হয় না!

আর একদিন কলেজে আসবার পথে দুই সখীতে কথা চলছে।

মীনুই প্রথমে কথাটা তুললে।

বল্লে, আচ্ছা চন্দ্রা, তুই তো সব হেসেই উড়িয়ে দিস্, কিন্তু এদিকে আমার প্রাণ যে যায়!

—কেন-কেন, আবার কি হ'ল?

চন্দ্রার হাসিমুখে কৌতুক মিশ্রিত কৌতূহল!

—কেউ কি সরাসরি 'ইলোপের' প্রস্তাব উত্থাপন করেছে নাকি? তাহলে

তো ব্যায়রাম সাজ্ঘাতিক বলতে হবে!

—বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে একেবারে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গিয়ে হাজির! বলে গঙ্গার জল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো—

যেন সামনে সাপ দেখেছে এমনিভাবে আঁতকে ওঠে চন্দ্রা! বলে, অ্যাঁ! কী সর্বনেশে কথা! যিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে পরমহংস হয়েছিলেন, তাঁর সাধনার পীঠস্থানে গিয়ে কিনা তোকে প্রতিজ্ঞা করতে বলে! লোকটার বুকের পাটা আছে বলতে হবে!

—শুধু কি তাই? বলে, গঙ্গাজল ছুঁয়ে যদি তুমি প্রতিজ্ঞা না করো তবে আজই গঙ্গায় আমি ডুবে মরব!

চন্দ্রার হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না! শুধোলে, তখন আমার সখীটি কি করে রক্ষা পেল?

মীনু উত্তর দিলে, আমিও দুষ্টু কম নই! হঠাৎ চীৎকার করে উঠলাম, উঃ, আমার পায়ে কি যেন কামড়ালো! বলেই এক ছুটে ওপরে উঠে পঞ্চবটিতে বসে হাঁপাতে লাগলুম! তখন প্রাণের দায়ে ট্যাক্সি ভাড়া করে আমায় বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পথ পায় না!

ভ্রূ কুঁচকে মীনু সখীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

চন্দ্রা বলে, তা বেশ করেছিস, নইলে তিন সত্যি করিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলেছিল আর কি!

—একদিন কৌশল করে না হয় বাচা গেল, কিন্তু নিত্যিকার এই ভ্যানর-ভ্যানর আর ভাল্লো লাগে না চন্দ্রা! তোর মাথায় তো অনেক বুদ্ধি খেলে, আমায় একটা প্ল্যান বাতলে দিতে পারিস?

চন্দ্রার মগজে সত্যি বুঝি দুষ্টু সরস্বতী ভর করেছে! বল্লে, এক কাজ কর্ তবে। সামনেই তো ভাই-ফোঁটা, সবাইকে এক চালা-নেমন্তন্ন করে বোস!

মীনু ওর প্রস্তাব শুনে সত্যি অবাক হয়! শুধোয়, ভাই-ফোঁটার নেমন্তন্ন? কিন্তু ওরা যে আমাকে বউ করতে চায়! বোন বলে ডাকতে কি রাজী হবে?

চন্দ্রা হাসতে হাসতে বলে, দেখ না একবার জালটা ফেলে। তোর চম্পক

অঙ্গুলির আকর্ষণও তো বড় কম নয়। নাই-মামার চেয়ে কানা-মামাও তো অনেকে কাম্য বলে মনে করতে পারে!

মীনু হিসেব করে উত্তর দেয়, তাহলে বেশ খস্‌বে আমার! ষাটের আশীর্বাদে সংখ্যায় তো নেহাৎ কম নয় ওরা!

—সেটুকু স্বার্থ ত্যাগ তোকে করতেই হবে মীনু! বিজ্ঞের মতো জবাব দেয় চন্দ্রা। জানিস তো একটা নেশা কাটিয়ে উঠতে হলে আর একটি নেশার আশ্রয় নিতে হয়। যারা ডাক্তারের পরামর্শে সিগারেট ছেড়ে দিতে মনস্থ করে তারা রাতারাতি নস্যির স্মরণাপন্ন হয়! এ-ও অনেকটা তাই। বউয়ের পরিবর্তে বোন! নাকের বদলে নরুণ পেলাম—তাক-ডুমা-ডুম-ডুম! আপন রসিকতায় আপনি হাসতে থাকে চন্দ্রা!

মীনু বল্লে, আচ্ছা তুই যখন প্ল্যান দিচ্ছিস—একবার চেষ্টা করে দেখি! কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হয় না—ওরা ভাই-ফোঁটার নেমন্তন্ন কেউ গ্রহণ করবে!

এই পরিকল্পনার দুই দিন পরের কথা।

একটা পার্কে দুই সখি এসে মিলেছে সন্ধ্যাবেলায়!

চন্দ্রার আগ্রহ আজ অপরিসীম। জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ রে মীনু, ভাইফোঁটাতে সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিলি তো?

মীনু মাথা নেড়ে জবাব দিলে, হুঁ! আমি নিজে সকলকে বলেছি। আর আশ্চর্য কাণ্ড দেখেছিস ভাই, সবাই এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। আমার হাত থেকে ফোঁটা নিলে সবাই। কত তাদের উৎসাহ! কেউ বলে চন্দন দিয়ে কপাল লেপ্‌টে দাও, কেউ বলে কাজল পরিয়ে দাও। এমনি কত বায়নাক্কা!

—তারপর?

—হ্যাঁ, একটা বিষয়ে নেমন্তন্ন করে খুব লাভ হয়েছে আমার।

—কি রকম? কি রকম?

সাগ্রহে প্রশ্ন আসে চন্দ্রার কণ্ঠ থেকে।

—সবাই আমাকে একখানি করে শাড়ী উপহার দিয়েছে।

—আর কিছু?

—যাবার সময় সবাইকার ফিস্-ফিস্ গলায় সিনেমায় যাবার নেমন্তন্ন।

— তুই গিয়েছিলি নাকি কারো সঙ্গে ?

—পাগল হয়েছিস্ ! আমার যেন আর খেয়ে কাজ নেই ! রাত্তিরে আমার ভায়েদের নেমন্তন্ন করেছিলাম। সে সব খাবার তো ওদের দেবার মত বাজার থেকে আনাই নি ! সব নিজে হাতে রান্না করেছিলাম আমি। ভাইয়েরা খেয়ে-দেয়ে ফিরতে তো রাত বারোটা বেজে গেল !

—বেশ করেছিস ! তুই যদি কারো সঙ্গে সিনেমায় যেতিস তবে সব কেস্ খারাপ হয়ে যেত ! এইবার তোকে আর একটি প্রশ্ন শুধু করবার আছে। খুব ভেবে-চিন্তে জবাব দিবি।

— অত ভণিতা করছিস কেন ? জিজ্ঞেস করে ফেল্ না ! তোর কাছে কোন কথা আমি লুকবো নাকি ?

একটু অভিমানের স্বরে জবাব দেয় মীনু।

— আচ্ছা, যারা দিন-রাত্তির তোর আশেপাশে ভ্যানর-ভ্যানর করে বেড়ায় তাদের দলের এমন কেউ আছে—যে ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন পেয়েও আসে নি ? কিম্বা রাগারাগি করছে তোর সঙ্গে ?

—হুঁ ! বুঝতে পেরেছি। 'এ্যাসিড্ টেষ্টে' প্রমাণিত হল—ওই পাগলই চোরা মানুষ। এসে চুপচাপ বসে থাকে—আর মাঝে মাঝে বলে, তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী কথা আছে—সেই লোকটি ! শুধু যে নেমন্তন্ন নেয় নি তাই নয়, শাসিয়ে চিঠি লিখেছে, সে নাকি আমায় খুন করে ফাঁসিকাঠে ঝুলবে ! আর ওর লেখা সেই চিঠিখানি নাকি আমি পুলিসে জমা দিতে পারি ! একেবারে আস্ত পাগল !

—হুঁ ! বুঝতে পেরেছি। 'এ্যাসিড্ টেষ্টে' প্রমাণিত হল ওই পাগলই তোর বর !

—অ্যাঁ ?

—হ্যাঁ !

পৈত্রিক নামটা কিছুতেই পছন্দ নয় হরেকেষ্টর। ওর ইচ্ছে সিনেমার তারকা হয়। কিন্তু কাগজে-কাগজে যখন বিজ্ঞাপন বেরুবে—"হরেকেষ্ট পতিতুণ্ডীর সাবলীল অভিনয়"—তখন পাড়ার ছেলেরা নিশ্চয়ই মুখ টিপেটিপে হাসবে।

অনেক ভেবে চিন্তে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলের বিভিন্ন ও বিচিত্র রকমের নাম বাছাই করে, বহু রকম পত্র-পত্রিকার ধাঁধার জবাবের নামাবলী দেখে—একটিও মনোমত নাম খুঁজে পেলো না হরেকেষ্ট।

হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে ওর দেখা।

সে বল্লে, এত ভাবছ কেন তুমি? এমন নাম রাখবে যা শ্রুতিমধুর হবে, আর 'অ্যালিটারেশনে' দিব্যি শোনাবে। যেমন ধরো, পাংশু পতিতুণ্ডী। হাজার নামের মধ্যে মিশে যাবে না। সবাই বুঝবে—একেবারে আলাদা। অনিল, গোপাল—এমন নাম তো ঘরে ঘরে মেলে। পাংশু পতিতুণ্ডী—শুনেছ কখনো?

হরেকেষ্ট ওর বন্ধুর কথা যত শোনে তত অবাক হয়। সত্যিই তো! পাংশু পতিতুণ্ডী…এমন বিশিষ্ট নাম আর কারো আছে?

উত্তর দিলে, চমৎকার। তোর দেওয়া নামই আমি গ্রহণ করলাম। আজ কি বার, এখন কি লগ্ন, শুভ কি অশুভ—কিছুমাত্র বিবেচনা করব না। মানিব না দিন-ক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার…আজ থেকে পৈত্রিক নাম পরিত্যাগ করলাম—ব্রাহ্মদের যজ্ঞ-উপবীত পরিত্যাগ করারই মত। নতুন নাম আর নতুন জন্ম হল আমার আজ এই মুহূর্তে। হরেকেষ্ট মরে গেল, তোরা আমায় জানবি—পাংশু পতিতুণ্ডী বলে।

একটু দম নিয়ে আবার বল্লে, অন্য নামে ডাকলে আমি সাড়া দেব না, এই নাম ছাড়া অন্য নামে চিঠি এলে আমি ফেরত দেব—এই মম প্রতিজ্ঞা ভীষণ।

বন্ধু কিন্তু ওর ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেছে! সে নেহাৎ তামাসা করেই প্রস্তাবটা করেছিল। হরেকেষ্ট যে এমন ভাবে সেটা লুফে নেবে—সে তা ভেবেই দেখে নি! পাগলাকে 'নাও' না ডোবাতে বলার বিপদ আছে বৈ কি!

হাসতে হাসতে বন্ধু বিদায় নিলে।

কিন্তু 'পাংশু পতিতুণ্ডী' নামের ভেতর দিয়ে হরেকেষ্ট নতুন উদ্দীপনা লাভ করল। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

তার নিত্য কর্ম হল বিভিন্ন ষ্টুডিওতে ঘুরে বেড়ানো এবং পরিচালকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের গুণাবলী স্বমুখে কীর্তন।

কিন্তু মুস্কিল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ পরিচালক সামনা-সামনি দেখা করে না, সহকারী দু-এক কথা বলে ছেড়ে দেয় কিম্বা সোজা দারোয়ানের কাছে নেতিবাচক কথা শুন্লে পত্রপাঠ বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু পাংশু পতিতুণ্ডীর ধৈর্য অসীম।

দিনে দিনে সে নব নামানুসারে পাংশু হতে থাকে বটে, কিন্তু আশা আদপেই ছাড়ে না।

বাড়িতে সে কম সময়ই থাকে।

পিসীমা বলেন, বাছা আমার কিচ্ছু মুখে দেয় না! ও যে কি করে বেঁচে আছে—আমি সেই কথাই শুধু ভাবি।

ওর বাবা একদিন সিঁড়ির মুখে ওকে আটকে ফেল্লেন!

বল্লেন, আজকাল তো তোকে দেখতেই পাই নে! এমন বাউণ্ডুলের মত হয়ে ঘুরছিস্ কেন বল্ তো? এদিকে আমার তেজপাতার ব্যবসাটা লোকের অভাবে ডকে উঠতে বসেছে। আমি আর কোন কথা শুনতে চাই নে। কাল থেকে মাল-গুদামে গিয়ে বসতে হবে।

বাবার শাসন শুনে জীবনে ঘেন্না ধরে গেল পাংশু পতিতুণ্ডীর। হয় সিনেমা-

তারকা হবে, নয়তো এ জীবন আর রাখবে না। তার বিরাট প্রতিভা আর বহু মূল্য জীবন কিনা আটকে রাখবে তেজপাতার গুদোমে? এর চাইতে মৃত্যু শ্রেয় তার।

যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, পাংশু পেছনকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

কাল থেকে তাকে তেজপাতার তদারক করতে হবে। মোহনভোগের প্লেটে যে দু-একটি তেজপাতা থাকে তাকে সহ্য করা যায়, তাই বলে তেজপাতার গুদোমের মধ্যে!

হায় পিতা! তুমি পাংশুর প্রতিভা প্রত্যক্ষ করলে না!

পাংশু রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর মনের সঙ্গে লড়ছে এই সঙ্কটে কি করা কর্তব্য!

হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে—সে একেবারে লেকের ধারে এসে পৌঁছে গেছে।

লেক কি তাকে কোন হদিশ দিতে পারবে? সে ধীরে ধীরে গিয়ে একটি নারকেল গাছের বেঞ্চে উপবেশন করলে।

লেকের জলে পাংশুর ছায়া পড়েছে।

ছায়াটা কি ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে? হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

ঠিক কথা। এ প্রাণ তেজপাতার গুদোমে নিয়োজিত হবার আগে লেকের জলেই তাকে বিসর্জন দেবে।

জায়গাটা আরো একটু নির্জন হওয়ার প্রয়োজন আছে। নইলে আশে-পাশের মানুষগুলো একেবারে হৈ-হৈ করে উঠবে। মরা তার হবে না। খবরের কাগজে একটা কেলেঙ্কারী খবর ছাপা হবে। উল্টে কোর্টে গিয়ে ফাইন দিতে হবে। মরবে সে ঠিকই। কিন্তু কোন সহৃদয় সাক্ষী রাখবার বাসনা তার নেই!

পাংশু পতিতুণ্ডী মরণের তপস্যায় বসল।

কতক্ষণ সে ওই ভাবে বসেছিল নিজেও ঠিক জানে না। হঠাৎ একটা কথা ঠকাস্ করে তার কানে গিয়ে পৌঁছুলো—

—মুখটা তুলুন তো!

কি সর্বনাশ! পুলিস নাকি? আত্মহত্যার সঙ্কল্পটা কি মুখের মধ্যে ছাপা হয়ে গেছে?

পাংশু এবার সত্যি সত্যিই পাংশু হয়ে উঠল। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, কিন্তু পুলিস ধরলে সারা জীবন ভুগতে হবে।

—কৈ, মুখটা তুলুন না! নববধূ তো নন!

আবার সেই হুমকি!

"পড়েছি মোগলের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে॥"

মুখ তোলার আগে পাংশু চোখ খুলে ফেল্লে।

না, পুলিস নয়। বুস্ সার্ট পরা এক ব্যক্তি। চুল ওলটানো, হাতে সিগারেটের টিন।

একটু পেছন হটে, দুধারে ঘাড় কাত করে, চশমাটা খুলে ফেলে ব্যক্তিটি উক্তি করলে, যেমনটি আমি চেয়েছিলাম ঠিক তাই।

বিরক্ত হয়ে পাংশু শুধোলে, কি চেয়েছিলেন আপনি?

ভদ্রলোক বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না। মুখে মৃদু হাসি। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, সিনেমায় নামতে চান?

পাংশুর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল। সে ঠিক কানে শুনছে তো? অথবা তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা এই ছদ্মবেশে এসে তাকে দর্শন দিয়েছেন!

ভদ্রলোক বল্লেন, অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কি? আমি চিত্র-পরিচালক ঘনশ্যাম খাসনবীশ। একটি ভিলেনের মুখ খুঁজতে বেরিয়েছি। সারা দিন ধরে খুঁজেছি। অবশেষে সিদ্ধিলাভ হল এই লেকের ধারে।

পাংশুর মনে হল—সারা পৃথিবীতে যেন অকস্মাৎ বসন্ত সমাগম হয়েছে। কুঞ্জে-কুঞ্জে কুহু তান শোনা যাচ্ছে। রামধনু উঠেছে সারা আকাশ জুড়ে!

কোথায় তেজপাতার গুদোম, আর কোথায় সিনেমার ভিলেন!

—নায়িকার টুঁটি টিপে ধরতে হবে কি? বলুন! আমি এক্ষুণি প্রস্তুত আছি।

বিপুল বিক্রমে উঠে দাঁড়াল পাংশু পতিতুণ্ডী।

চিত্র পরিচালক বল্লেন, ঠিক এই মুহূর্তে যদি তুমি নায়িকার টুঁটি টিপে ধরো তা হলে আমার ছবিরই গঙ্গাযাত্রা হবে। সে সব কথা পরে আলোচনা করব। আমি তোমায় এমন ট্রেণিং দিয়ে দেব যে, গোটা কলকাতার শহরের লোক তোমার চেহারা দেখে আঁতকে উঠবে। মেয়েদের দাঁতকপাটি লাগবে, আর কোলের ছেলে অক্কা পাবে সঙ্গে সঙ্গে। সেই ছবি কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হবে। যারা গভীর রাত্রে পোষ্টার লাগাবে—তাদের সম্বন্ধেও আমার ভাবনা হচ্ছে।

পাংশু বলে, এই রকম একটি ভূমিকাই তো আমি চাই। সবাই আমায় ভয় করবে, মনে রাখবে আর অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবে—যেন না আমায় মুহূর্ত্তমাত্র ভুলে থাকে।

পরিচালক বল্লেন, ঠিক তাই হবে। এই নাও আমার ঠিকানা। আমার সঙ্গে দেখা কোরো। অভিনয় কাকে বলে আমি তোমায় শিখিয়ে দেব।

পাংশু ফিরে এলো, কিন্তু তার নিজের গৃহে নয়।

সেখানে রয়েছে বাবা আর তেজপাতা।

ওর এক বন্ধুর গৃহে গিয়ে ও আশ্রয় গ্রহণ করলে। সবাইকে সে তার আশু বিরাট সম্ভাবনার কথা বলে বেড়াতে লাগল। সবিস্তারে - ডাল-পালা সমন্বয়ে।

বন্ধুটির মনে আশা—পাংশুর লেজুড় হিসেবে তারও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। সেই জন্যে পাংশুকে সে রীতিমত তোয়াজ করে চলে।

চিত্র-পরিচালকের কথাকে ভিত্তি করে সে দরজীর দোকানে গিয়ে রকমারী

জামা তৈরী করে আর ভবিষ্যৎ স্বর্ণোজ্জ্বল কাহিনী শোনায়। সেলুনে গিয়ে নতুন প্যাটার্ণে চুল ছাঁটাই করে। পাড়ার জুতোর দোকানে অভিনব ফ্যাসানে জুতো তৈরী করে।

এই ভাবে তার এক বিরাট ভক্তদল গড়ে উঠেছে। কেউ আর তার কাছ থেকে পয়সা কড়ি চায় না। পাশে সিনেমা দেখবে, চাই কি পাংশুর সঙ্গে দু-এক সীনে নেমে যাবে, এই ওদের মনের কামনা।

পাড়ার উঠতি গুণ্ডা দলের মোড়ল হয়ে উঠেছে পাংশু। ওর যখন ছবি চলবে—ওরা দল বেঁধে গিয়ে টিকিটঘরের সামনে ভিড় করবে! মুখে-মুখে ছবিটা সম্পর্কে আজব কাহিনী ছড়াবে, আর ছবি চলাকালে সিটি বাজাবে। দায়িত্ব কি ওদের কম?

পাংশুর অঙ্গুলি হেলনে এই বিরাট বাহিনী ওঠা-বসা করে।

হঠাৎ একদিন পাংশুর খেয়াল হল—তাই তো! সেই পরিচালকের সঙ্গে তো দেখা করা হয় নি!

তাড়াতাড়ি বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ঠিকানাটি নিয়ে সে যথাস্থানে হজির হল।

পরিচালক মশাই তাকে দেখে ভূত দেখার মতই আঁতকে উঠে বল্লেন, অ্যাঁ! তুমি আজ এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে! আমি তোমায় গরু-খোঁজা করেছি কলকাতার শহরে—

পাংশু বিনীত কণ্ঠে শুধোলে, আজ্ঞে আমার সেই ভিলেনের পার্টটা?

পরিচালক ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে উত্তর দিলেন, গতকালই সে পার্টটা তোলা শেষ হয়ে গেল।

জুতোর দোকানে, সেলুনে, দরজীর দোকানের দেনাগুলি পাংশুর মুখে প্রস্ফুট হয়ে উঠল!

শহরতলীর একান্তে এই জমিটি ফণী-মনসার ঝোপ আর বাঁশঝাড়ে ভর্তি ছিল। এখন নামকরণ হয়েছে "নিরালা কলোনী"।

পূর্ব পাকিস্থান থেকে দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-নর-নারী যখন মান ও প্রাণ বজায় রাখতে কলকাতায় পালিয়ে আসছিল তখন কয়েকজন সুযোগ-সন্ধানী, যারা বরাবর কলকাতায় চাকরি-বাকরি করছে এবং দীর্ঘকাল থেকে এখানে আছে, একটা গোপন চুক্তি করে একদিন অতর্কিত নৈশ আক্রমণে এই ভূমিখণ্ড 'জবর দখল' করে নেয়।

বসুমতী বীরভোগ্যা একথা চিরকালই শোনা যায়। জমির যিনি আসল মালিক তিনি থাকেন দূরে—কাজেই খবরটা পেতে তাঁর অনেক বিলম্ব হল।

ইতিমধ্যে জমির ফণী-মনসার ঝোপ সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, এখান-ওখানকার গর্ত ভরাট করে সমতল করে ফেলা হয়েছে এবং প্রয়োজনের বাইরে যে সব বাঁশঝাড় জায়গা আটক করে রেখেছিল সেগুলি সমূলে বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

রাতারাতি পাশাপাশি গড়ে উঠেছে অনেকগুলি কুটির। কোনটা হোগলা পাতার, কোনটা করোগেটেড টিনের, আবার কোনটা লাল টালির।

'নিরালা কলোনী'র সাইন বোর্ডটাও যেতে আসতে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রয়োজন হলে বাঙালী যে একতার প্রদর্শনী করতে পারে এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কলোনীটি দেখে সেকথা অস্বীকার করবার জো নেই।

এখানে নতুন করে যারা নীড় বেঁধেছে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধতা দেখে জমির মালিক পিছু হটে যাবেই—তখন কায়েমী করে পাকা দালান বা পাকা কুঠরী তুলতেই হবে। এখন শুধু কঞ্চির বেড়া আর ভেন্না গাছের ডাল পুঁতে জমির সীমানাটাকে বজার রাখা।

এমনি পাশাপাশি দুটি প্লটে বাস করেন ক্যানভাসার কোকিলেশ্বর কাঞ্জিলাল, আর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী কুলকুণ্ডলিনী দেবী।

সেদিন অতি ভোরে কুলকুণ্ডলিনী দেবীর কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠের উচ্চগ্রামের ধ্বনি শুনে আশেপাশের কুটিরের মানুষগুলির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চুরি হয়েছে না কেউ মারা গেছে?

সমবেদনা জানাতে মেয়ের দল অনেকে এগিয়ে এলো। কিন্তু অপহরণও নয়—শোক সংবাদও নয়।

পাশের প্লটের কোকিলেশ্বর কাঞ্জিলালের পোষা ছাগল কুলকুণ্ডলিনী দেবীর লক্‌লকে লাউয়ের ডগাগুলো বেমালুম চর্বণ করে গলাধঃকরণ করে ফেলেছে!

কুলকুণ্ডলিনী দেবীর নাকি মনোবাসনা ছিল, ওই লক্‌লকে লাউডগা দিয়ে তিনি দিব্যি ডাল-ছড়ানো তরকারি রান্না করবেন। তাঁর সযত্ন লালিত আকাঙ্ক্ষাকে অবহেলায় অতিক্রম করে কোকিলেশ্বরের ছাগল কাল সন্ধ্যাবেলা কখন যে অপকর্ম করে গেছে, কলোনীর কাক-পক্ষীতেও তা জানতে পারে নি!

কুলকুণ্ডলিনীর কণ্ঠ থেকে যে কথাগুলি অর্গলমুক্ত হচ্ছিল তা কর্ণে সুধা বর্ষণ তো করেই না, উপরন্তু ঊর্ধ্বলোকবাসী সাতপুরুষকে পর্যন্ত নরকের দ্বার দেখিয়ে দেয়!

নাকি সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে তিনি নিবেদন করছিলেন, ওই যমের অরুচি ক্যান্‌ভাসার সারাদিন থাকবে না বাড়ি, আর মানুষকে জব্দ করবার জন্যে ছাগলটাকে দিয়ে যাবে ছেড়ে! সেদিন আমার দুটো ধানী লঙ্কার চারা উপড়ে ফেলে মুখে করে নিয়ে গেছে—আমি কিচ্ছু বলি নি। আজ আবার লাউয়ের ডগার মুণ্ডুপাত করা! কিছুতেই আমি সইব না এই অত্যাচার! ওই ছাগলের যে মালিক তারই আমি মুণ্ডুপাত করব!

পাশের ঘরের দাওয়ায় বসে ক্যান্‌ভাসার কোকিলেশ্বর আপন মনে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিলেন— মুখে তিনি একটি কথাও বলেন নি !

সকাল থেকে ক্রমাগত এই অষ্টোত্তর-শতনাম জপ শুনে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি উদাসভাবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন, আমি ছাগল পুষেছি- দুধ খাব বলে। কারো ভিটেবাড়ির প্রজা আমি নই ; কিন্তু লবৃলকে লাউয়ের ডগা চিবিয়ে খাবার জন্যে যদি কারো জিব লক্‌লক্ করে থাকে তবে ভাল করে জমির বেড়া দিলেই হয় ! সেজন্য নিরীহ ছাগলকে দোষারোপ করা কেন বাপু, কেষ্টর জীব·· আহা ! কচি শাকপাতা বড্ড ভালোবাসে।

কাঞ্জিলালের মন্তব্য শুনে মেয়েরা মুখে আঁচল দিয়ে পালিয়ে গেল নিজের নিজের ঘরে।

ক্যান্‌ভাসারের কণ্ঠ নীচু স্বরে বাঁধা হলে হবে কি, তার জ্বালা বড্ড বেশী। কুলকুণ্ডলিনী দেবীর মনেও তা জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে উপযুক্ত ইন্ধনের অভাবে সেদিনকার দাবানল অকস্মাৎ অর্ধপথেই নির্বাপিত হয়ে গেল।

আর একদিনের ঘটনা।

বালবিধবা কুলকুণ্ডলিনী দেবী এখনো ত্রিশ অতিক্রম করেন নি বটে, কিন্তু ধর্মচর্চায় ও পূজাপার্বণে তার একান্ত নিষ্ঠা। বিধবা হবার পর থেকেই তিনি নানারকম ব্রত করে আসছেন। সেদিন কি উল্লেখযোগ্য ব্রত ছিল, সেইজন্যে তিনি আগে থেকেই ইস্কুলে ছুটি নিয়েছেন। অতি প্রত্যূষে সামনের পুকুরে স্নান সমাপনান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করে তিনি নিজের মাটির দাওয়া চমৎকার করে লেপেছেন। পানের ওপর তৈল-সিন্দূর-চর্চিত করে কয়েকটি সুপুরি স্থাপন করেছেন, তারপর শুদ্ধমতী হয়ে সন্নিকটবর্তী নলকূপ থেকে স্বচ্ছ বারি আনতে গেছেন ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে। ফিরতিমুখে নিজের জমির সীমানায় প্রবেশ করতে গিয়ে তিনি যা অবলোকন করলেন—তাতে তাঁর চক্ষু দুটি কপালে গিয়ে উঠল !

ক্যান্‌ভাসারের ছাগলটি কোন্ ফাঁকে তাঁর দাওয়ায় উঠে নিশ্চিন্ত আরামে

পান চিবুচ্ছে।

কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে ছুটতে তিনি দাওয়ায় এসে উঠলেন। ব্রতের জন্যেই দাওয়ার এক কোণে একটি ঝুড়িতে কয়েকটি ফল কলাপাতা দিয়ে ঢাকা ছিল। তিনি উঁকি মেরে দেখলেন ফলগুলি ইতিমধ্যেই ছাগলের উদরে প্রবেশ করেছে; এখন সেই নিরীহ জীব তাম্বুল চর্বণে আত্মনিয়োগ করেছে!

ফল কাটবার বঁটিখানি পাশেই কাত করা ছিল।

কুলকুণ্ডলিনী দেবীর মনে মনে বাসনা জাগছিল—ওই বঁটিটি ছাগলের স্কন্ধদেশে সজোরে বসিয়ে দেন! কিন্তু তিনি একে বালবিধবা, তার ওপর ব্রতের জন্য শুদ্ধচারিণী হয়ে উপবাসী আছেন! এ হেন অবস্থায় মন যা চায় তা সম্পাদন করা সমীচীন হবে না বুঝতে পেরে, সেই বঁটি হস্তে তিনি পাশের কুটিরের দিকে অগ্রসর হলেন। উদ্দেশ্য—ছাগলের মালিক ক্যান্‌ভাসারকে যদি পাওয়া যায় তো তিনি তার নাক কেটে নেবেন।

কিন্তু পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ক্যান্‌ভাসার ভদ্রলোক সে সময় নিজের কুটিরে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তারই জন্যে নিজের নাসিকাকে অক্ষত রাখতে সক্ষম হলেন!

কুলকুণ্ডলিনী দেবী যখন ক্যানভাসারের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বঁটি হাতে রাগে ফুলছিলেন সেই সময় দূর থেকে একটা ঢোলের আওয়াজ কানে এলো। কে যেন জোরে জোরে সবাইকে কি বলছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলেন ক্যান্‌ভাসার কোকিলেশ্বর কাঞ্জিলাল।

একটা বাঁশের খুঁটি ধরে দাওয়ার ওপর থপ্ করে বসে পড়ে বল্লেন, এখানকার বাসা এইবার ভাঙল।

মুহূর্তে কুলকুণ্ডলিনি দেবীও যেন ফল আর তাম্বুলের শোক বেমালুম ভুলে গেলেন।

শুধালেন, কেন? বাসা ভাঙবে কেন? আমরা সবাই খাজনা দিতে রাজী

আছি।

কোকিলেশ্বর উত্তর দিলেন, খাজনা তো পরের কথা, জমির যিনি মালিক, তিনি এই জমি ছাড়তে রাজী নন। ওই শুনুন, ঢোলে কাঠি দিয়ে জমিদারের লোক কি বলে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে সারা কলোনীর লোক ঢোলওয়ালার পিছনে এসে জড় হয়েছে।

ঢোলওয়ালা প্রাণপণে বাজিয়ে চলেছে—আর একটি লোক চীৎকার করে বলছে, তিনদিনের মধ্যে এই জমি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। জমির মালিক এখানে নিজের বসতবাটি তৈরী করবেন। যারা জবর দখল করেছ সব উঠে যাও—

মৌচাকে যেন ঢিল ছোঁড়া হয়েছে।

কলোনীর লোকেরা রাগে ফুলছে আর বলছে—জমি আমরা ছাড়ব না।

একজন বলছে, জমি আমরা কিনে নেব—

আর একজন চ্যাচাচ্ছে, কুড়ি বছরে দাম শোধ করব—

কেউ কেউ মন্তব্য করছে, জমি আমরা লিজ নিয়েছি—

আবার আর একজন হুঙ্কার দিচ্ছে, খাজনা নাও! জমি থেকে উৎখাত করবার তোমরা কে?

এমনি হট্টগোলের মাঝখানে ক'জন অতি উৎসাহী চীৎকার দিয়ে বল্লে, ওই লোকটার ঢোলটা কেড়ে নাও তো কেউ!

করিৎকর্মা লোকের অভাব কোনকালেই হয় না। তাদের ধরে আনতে বল্লে বেঁধে নিয়ে আসে।

দুটি জোয়ান ছেলে ছুটে গিয়ে ঢোলওয়ালার ঢোলটা কেড়ে নিয়ে ছুরি দিয়ে ফাঁসিয়ে দিল—তারপর তাতেও যখন তাদের রাগ পড়ল না, তখন ওরা সামনের পুকুরে ঢোলটা ডুবিয়ে দিলে।

জমিদারের লোক পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে।

সেইদিন গভীর রাত্রে জমিদারের ভাড়া-করা গুণ্ডার দল অমাবস্যার অন্ধকারে কলোনী আক্রমণ করলে। কেউ কিছু ভালো করে বোঝবার আগেই কয়েক-

খানি কুটির ওরা তাড়াতাড়ি লাঠি চালিয়ে ভেঙে দিলে।

রান্নাঘরের হাঁড়ি-কুড়ি গেল গুঁড়িয়ে, গরু ভেড়া ছাগল ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগল। ছোট ছেলে আর মেয়েছেলের কান্নায় গোটা কলোনীর লোক জেগে উঠল।

শিক্ষয়িত্রী কুলকুণ্ডলিনী দেবী তাঁর কুটিরের আশেপাশে অজানা লোকের পায়ের শব্দ শুনে আঁতকে উঠে একেবারে পেছনকার দরজা খুলে ক্যান্‌ভাসারের ঘরের মধ্যে ঢুকে বল্লে, আমার বড্ড ভয় করছে!

ছাগলটা ব্যা ব্যা শব্দে ওকে আশ্বাস দিলে। ইতিমধ্যে গোটা কলোনীর বেটাছেলেরা সমবেত হয়ে জমিদারের লোকদের আক্রমণ করলে।

ওরা তখন বেড়া ডিঙিয়ে, পুঁইয়ের মাচায় হোঁচট খেয়ে, পুকুরে আচমকা হাবুডুবু করে, বাঁশঝাড়ে গায়ের ছাল-চামড়া ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পথ পায় না।

কিন্তু এক মাঘেই তো শীত পালায় না। যে কোন দিন গভীর রাত্রে জমিদারের হুকুমে আরো বেশী লোক এসে সব ঘর-দোর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে পারে।

শিক্ষয়িত্রী কুলকুণ্ডলিনী দেবীর রসনার বিষ সেইদিন থেকে একেবারে মরে গেছে। বুকের কাঁপুনি তাঁর কিছুতেই থামতে চায় না।

সন্ধ্যে হতেই ভয়ে ভয়ে ক্যান্‌ভাসারের দাওয়ায় উঠে বলে, আমার বড্ড ভয় করছে। রাত্তিরে আমি এই ঘরেই থাকব।

ক্যান্‌ভাসার কোকিলেশ্বর কাঞ্জিলাল তামাক টানতে টানতে বিষম খান। বলেন, সে কী কথা! লোকে শুনলে কি বলবে?

কুলকুণ্ডলিনী দেবী অসহায়ের মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উত্তর করেন, তাহলে আপনার ছাগলটা আমার ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে আসুন! রাত্তিরে ওর ডাক শুনে অন্তত বুঝতে পারব যে, ঘরে প্রাণী কেউ আছে!

ক্যান্‌ভাসার মুচকি হাসেন। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, কিন্তু ও যে আপনার লাউয়ের ডগা, লঙ্কার চারা, মায় আপনার থান পর্যন্ত চিবিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে।

শিক্ষয়িত্রী কুলকুণ্ডলিনী দেবী তখন মরীয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি অকূলে কূল পাবার আশায় কাঁপতে কাঁপতে বলেন, তা থাক্ ও আমার থান কাপড়। আপনি না হয় আবার নতুন শাড়ী কিনে দেবেন! কিন্তু একলা ঘরে থাকলে আমি হার্ট ফেল করে মারা যাব!

এর পর আর কোন কথা কাটাকাটি চলে না!

তাই ক্যান্‌ভাসারের ছাগল কুলকুণ্ডলিনী দেবীর ঘরে আশ্রয় পায়।

এই ঘটনার তিনদিন পরে জমিদারের লোকেরা নতুন উদ্যমে আর এক রাত্তিরে কলোনী আক্রমণ করে। একসঙ্গে অনেকগুলি লোক আক্রমণ করেছিল বলে বহু কুটির তারা ভেঙে ফেল্লে। তার ভেতর কুলকুণ্ডলিনী দেবীর কুটিরও একটি। ছাগলের ভার্ত আর্তনাদ সে রাত্রে কুলকুণ্ডলিনী দেবীর ঘরখানিকে কোন মতেই বাঁচাতে পারে নি!

নিরাশ্রয় গৃহহীনা শিক্ষয়িত্রী তাঁর লাউমাচার পাশে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিলেন। ক্যান্‌ভাসার কোকিলেশ্বর কাঞ্জিলাল এগিয়ে এসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, ভয় কি, আমার ঘর তো এখনো ভাঙে নি!

এরপর ঘটনার স্রোত যেভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চল্লো তার সব খবর জানানো সম্ভব নয়। তবে দিন পনেরো বাদে কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে মোটা হরফে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল, পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের অবগতির জন্য আমরা হুবহু সেই অংশটি গল্পের পরিশিষ্টরূপে তুলে দিচ্ছি:

সমাজ-সংস্কারক জমিদারের বদান্যতায়
নিরালা কলোনীতে বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান

আমরা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, সমাজ-সংস্কারক জমিদার শ্রীবহুরূপী বটব্যাল তাঁহার জমির উপর নির্মিত 'নিরালা কলোনী'তে নিজ ব্যয়ে একটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন।

এই কলোনীর অধিবাসীরা প্রথমে জবর দখল করিয়া জমিটি অধিকার করে। জমিদার বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের উৎখাত করিতে অক্ষম হন। ইতিমধ্যে

উক্ত জমিদারের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, শ্রীকোকিলেশ্বর কাঞ্জিলাল নামে একজন ক্যান্‌ভাসার একটি বালবিধবাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া কলোনীর বিরাগভাজন হন। জমিদার ইতিপূর্বে বহু জনহিতকর কাজ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারকরূপেও তিনি বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন এবং তিনি নিজেও বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই দুইটি নর-নারীকে কলোনীর সকল অধিবাসী একঘরে করিয়াছে, তখন তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া কোকিলেশ্বর ও কুলকুণ্ডলিনীর বিবাহের সম্পূর্ণ ব্যয়-ভার বহন করিয়াছেন।

আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে, উক্ত সমাজ-সংস্কারক জমিদার তাঁহার জমিতে সকলকে বসবাস করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন এবং উক্ত ভূখণ্ডটি নব-দম্পতিকে যৌতুক দিয়াছেন। অতি শীঘ্রই এইখানে "কোকিলেশ্বর-কুল কুণ্ডলিনী বালিকা বিদ্যালয়" গড়িয়া উঠিবে এবং কুলকুণ্ডলিনী দেবী প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণে সম্মতা হইয়াছেন। আমরা সমাজ-সংস্কারক জমিদার শ্রীবহুরূপী বটব্যালের ভূয়সী প্রশংসা করি এবং নব-দম্পতির মধুময় জীবন কামনা করি।'

[সন্ধ্যার ঠিক আগের ঘটনা। কোকেনের দোকানটি ঠিক হিন্দু ও মুসলমান পাড়ার মাঝামাঝি। কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়েছে। রাস্তাঘাট জনশূন্য ও থম্‌থমে। হিন্দু পাড়ার গোকুল কুণ্ডু আর মুসলমান পাড়ার আবদুলের মনটা অনেকক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্‌ করছে। ওদের দুজনেরই সন্ধ্যের নেশা কোকেন ফুরিয়ে গেছে। অথচ না আনলেও নয়। নেশাখোরদের মজাই এই যে, নেশার জিনিসটি ফুরিয়ে গেছে মনে হলেই জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সেই পদার্থটি হস্তগত করতে জীবন বিপন্ন করতেও তারা ইতস্তত করে না। আজকের সন্ধ্যায় গোকুল ও আবদুলের সেই অবস্থা। দেখা গেল গোকুল মুসলমানের লুঙ্গি পরিধান করল এবং আবদুল অনেক দিনের পুরোনো একটি ধুতি পরে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে ঘরের বার হোল। গোকুলের হাতে লাঠি আর আবদুলের কোমরে গোঁজা ছোরা। ভয়ে উভয়েরই বুক দুরু দুরু করছে, কিন্তু কোকেন সংগ্রহ করতে হবে।]
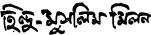
গোকুল। [আপন মনে] তাই তো! রাস্তায় যে একেবারে জনপ্রাণীর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মুসলমান পাড়ার মোড় অবধি কি যাব?

আবদুল। হুঁ! দোকানটা হেঁদুপাড়া ঘেঁষে না করলেই কি চলছিল না! দরকার আমার—আর দোকানটা গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওহ্‌ তিন মাইল তফাৎ—

গোকুল। (আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে) তাই তো যাবো— না ফিরব? পাড়ার একটা লোকও দেখছি না যে—ডেকে নিয়ে গল্প করতে করতে ঘুরে আসব। সন্ধ্যের মুখেই সবাই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে—

আবদুল। (জোরে একটা শিস্ দিয়ে) ওঃর মনসুর। এই সময়টা কোথায় গিয়ে আটকে রইলি? ভাবলাম ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব—। একেবারে কুঁড়ের বাদশা। যেখানে যাবে একেবারে দস্তি পাতিয়ে বসবে!

গোকুল। নাঃ—রাস্তায় তো কোন হাঙ্গামা হুজুগ নেই। এই ফাঁকে কিছু মৌতাত হাতে করে সোজা বাড়ির দিকে লম্বা—

আবদুল। পাড়াটা বিলকুল ঠাণ্ডা আছে বলেই মালুম দিচ্ছে। আরে—যাব আর আসব। ভয়-ডর কিসের? চিজ না পেলে আমার রাত কাটবে কি করে?

গোকুল। (আরো এগিয়ে আবদুলের ছায়া দেখে থমকে দাঁড়াল) ওরে বাবা! কার যেন ছায়া দেখা যাচ্ছে! গলির মোড়ে ঘাপটি মেরে আছে বলে মনে হচ্ছে!

আবদুল। (আপন মনে মাথা নেড়ে) হুঁ! ফাঁদ পেতেছে বলে মালুম হচ্ছে। হুঁ! আমার নাম আবদুল মিঞা! অত সহজে হটবার ছেলে আমি নই।

গোকুল। শ্রীদুর্গা বলে বেরিয়ে যখন পড়েছি—কোকেন হস্তগত না করে আর ফিরছি নে। নইলে সারারাত এপাশ-ওপাশ করতে হবে।

আবদুল। কোকেন না কিনে বাড়ি ফিরছে না এই মিঞা! খোদার নাম করে বেরিয়েছি, 'মৌতাত' আমার চাই।

(উভয়ে এগুতেই একেবারে সাম্‌না-সামনি এসে দাঁড়াল)

গোকুল। (লাঠি শক্ত করে ধরে) এই - কে তুই সত্যি করে জবাব দে।

আবদুল। আল্লার দোহাই—আমি হেঁদু—; তুই কে?

গোকুল। হরি! হরি! হরি!—আমি মুসলমান!

আবদুল। সত্যি করে বল্ কে তুই?

গোকুল। তাই তো! (আবদুলের পরনে ধুতি দেখে) ও! তুমি হিন্দু, তাই বল ভাই। ধর থেকে প্রাণটা একেবারে উড়ে গিয়েছিল আর কি! আমিও হিন্দু—

আবদুল। আরে দোস্ত! তুই আমার সাথে মস্করা করছিস্! (লুঙ্গি দেখিয়ে)

তুই তো মুসলমান আছিস্! আমার ধুতি দেখে বল্‌ছিস্ তুই হেঁদু—! চল্‌ মেরা সাথ্‌—

গোকুল। (ভয়ে ভয়ে) কোথায় ভাই?

আবদুল। আরে দোস্ত, কোকেনের দোকানে—

গোকুল। (খুশী হয়ে) কোকেনের দোকানে? আরে প্রাণের কথা টেনে বলেছিস্ ভাই—আরে আমিও তো সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীদুর্গা বলে বেরিয়ে পড়েছি—

আবদুল। আল্লার কসম। কোকেন না খেয়ে মনে হচ্ছে যেন জান্‌ বেরিয়ে যাচ্ছে।

গোকুল। আল্লার কসম! (ভয়ে ভয়ে) তাহলে তুমি মুসলমান?

(লাঠি শক্ত করে ধরল)

আবদুল। দুর্গা মাইয়ের কথা বল্‌ছিলি না? তাহলে তুই সত্যি হিঁদু?

(ছোরা বাগিয়ে ধরল)

গোকুল। (হঠাৎ দূরে কি দেখে দারুণ উৎকণ্ঠায়) ওরে ভাই, কোকেনের দোকান যে এক্ষুণি বন্ধ করে দেবে। ঝাঁপ লাগাচ্ছে।

আবদুল। (ছুরি লুকিয়ে ফেলে) তাই তো রে দোস্ত। এতদূর এসেও কোকেন মিলবে না? তোরও তো কোকেন চাই?

গোকুল। (পরম আগ্রহে) হ্যাঁ ভাই, কোকেন না পেলে আমি মরে যাব।

আবদুল। আমারও তো সেই অবস্থা দোস্ত—চল দুজনে একসঙ্গে যাই।

গোকুল। কিন্তু ভাই তুমি যে মুসলমান।

আবদুল। তাই তো! তুমি দোস্ত হিঁদু আছ—। আচ্ছা এক কাজ কর।

গোকুল। কি ভাই?

আবদুল। দোস্ত, তোমার ওই লাঠিটা ফেলে দাও—

গোকুল। বেশ ভাল কথা! তোমার কোমরে গোঁজা ছুরিটা ফেলে দাও।

আবদুল। সাচ্‌ বাৎ—! নিকাল যা—(ছুরি ফেলে দিল)

গোকুল। দূর হয়ে যা।—(লাঠি ফেলে দিল)

আবদুল। আরে দোস্ত—কোকেন আমাদের চাই—

গোকুল। ঠিক কথা ভাই। কোকেন না হলে পেট ফুলে মারা যাব—

(দুজনে গলাগলি করে এগিয়ে গেল)

উভয়ের কণ্ঠে কাজী নজরুলের গান শোনা গেল।

গান

'বদ্‌না-গাড় তে কোলাকুলি করে—
নব-প্যাক্টের আশ্‌নাই,—
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি,
হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই!'

উভয়ে— জয় কোকেনের জয়!

(কোকেনের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল)

জানি, আমাদের কেবলি ছি-ছি করছ!

বিশেষ করে পুলিশ যখন আমাদের 'উঠতি গুণ্ডা' বলে সম্বোধন করল তখনই বুঝলাম, আমাদের সখের রকের আড্ডায় অকালে ভাঙন ধরবে।

কিন্তু তোমাদের শুধোই, আমরা কি শুধুই রকবাজ? শুধুই উঠতি গুণ্ডা? পাড়ায় আর আমাদের কি কোন পরিচয় নেই?

স্রোতের শ্যাওলার মত চিরটা কাল কি আমরা শুধু ভেসেই বেড়াব? রকে আমাদের একটু স্থিতি হয়েছিল, তাতেও তোমাদের আপত্তি?

আজ আমরা রকবাজ বলে সক্কলের চক্ষুশূল। কিন্তু চিরটাকাল কি তোমরা এই চোখেই আমাদের দেখতে? সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যুগটা এরই মধ্যে এমন বেমালুম ভুলে গেলে দাদারা? তোমরা তো কেউ তেতলায় আর কেউ দোতলায় শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাতে শুরু করলে, আর দুশমণদের সামনে মহড়া আগলাতে এগিয়ে দিলে আমাদের।

সেই সব দুঃস্বপ্নের রাত্তিরের কথা তোমরা ভুললেও, আমরা তার বিভীষিকা আদৌ ভুলতে পারি নি! একটি মাস একেবারে চোখের পাতা এক করতে পারি নি। অবশ্য তোমাদের বাড়ির গিন্নিরা গরম-গরম খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজা পাঠিয়ে দিয়েছে। সে তো বেমালুম প্রাণের দায়ে। পাছে গুণ্ডারা এসে গয়না কেড়ে নেয়, চুলের মুঠি ধরে চুরি করে পালিয়ে যায় অথবা একেবারে খতম করে রাখে, সেই ভয়েই ওই গরম গরম খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সে কি আমাদের অজানা ছিল? তবু আমরা বুক চিতিয়ে লড়েছি। তার কারণ

হচ্ছে এই যে ওটা আমাদের মান-সম্মানের কথা। বেপাড়ার গুণ্ডারা আমাদের পাড়ায় ঢুকবে—প্রাণ থাকতে এটা আমরা সইতে পারি না। তার চাইতে আমাদের মরণ ভালো।

তোমরা মাঝে মাঝে সিদ্ধি খাবার পয়সা দিয়েছ আর ভেবেছ যে, ওরই লোভে আমরা ক্রমাগত রাত জাগছি আর সারা পাডা টহল দিয়ে ফিরছি!

ভুল – একেবারে ভুল।

ওটা ছিল আমাদের ইজ্জতের প্রশ্ন! নইলে অন্য পাড়ার রকবাজদের কাছে আমাদের মান থাকবে কি করে?

তারপর সেবার, সেই যে পাড়ায় কলেরা লাগল! পাড়ার মোড়লরা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দরজা বন্ধ করে দিলে! দিনের পর দিন গোটা পাড়ায় ফিনাইল ছড়িয়ে, গন্ধক পুড়িয়ে, কর্পূর বিলি করে, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছে আমাদের। এতেই কি শান্তি ছিল? রাত জেগে কলেরা রোগীর শিয়রে বসে ঘড়ি-ঘড়ি ওষুধ-পথ্য খাওয়াতে হয়েছে।

যখন কিছুতেই ব্যামো থামে না—মহামারীর আকার ধারণ করল, হঠাৎ পাড়ার মোড়লরা এসে আমাদের ধরল, ঘটা করে মা-শীতলার পুজো দিতে হবে।

পাড়ার জন্য আমরা সবকিছু করতে পারি। ওই রকে বসেই ফর্দ ধরা হ'ল কে কত চাঁদা দেবে। প্রাণের ভয়ে পাড়ার মোড়লটা মোটা টাকার অঙ্ক বসিয়ে দিলে ফর্দে। আমরা মজাসে ঘটা করে পুজো শুরু করে দিলাম – তখন পাড়ায় কান পাতে কার সাধ্যি!

পুজো যখন নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল, সবাই আশে-পাশে তাকিয়ে দেখলে, ব্যামোর প্রকোপ বেশ কমে গেছে! তখন যে সব মোড়ল মোটা-মোটা টাকা দেবে বলে কথা দিয়েছিল, একেবারে বেমালুম সবকিছু ভুলে গেল। রাস্তায় দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যায়—আর চিনতেই পারে না। বাড়িতে ফর্দ নিয়ে দেখা করতে গেলে চাকর দিয়ে বলে পাঠায়, বাড়ি নেই!

কিন্তু আমাদের একটা কথার দাম আছে তো? ধার করে পুজা সমাধা

হয়েছিল, তখনও সব কিছু শোধ হয় নি। পাড়াল মোড়লেরা যখন মুখ ফেরালে তখন আমরা নিজের পথ্য নিজেরাই বেছে নিলাম! কাঁচির কৌশলে বহু লোকের পকেট সাফ করে সেই দেনা আমরা শোধ করি। হাজার হোক পাড়ার ইজ্জৎ রাখতে হবে তো!

ওই রকে বসেই প্রত্যেকের পাই-পয়সাটি আমরা মিটিয়ে দিয়েছি।

অনেক কথাই আজ আমাদের মনে পড়ছে। সেবার পাড়ার ঘনশ্যামবাবুর নতুন বিয়ে হয়েছে। নতুন বউ পূজায় এসেছে এখানে। অষ্টমীর দিন রাত্তিরে সেই বউকে গয়না পরিয়ে একেবারে দুর্গো-প্রতিমে সাজিয়ে ঘনশ্যামবাবু বেড়িয়েছেন যত রাজ্যের বারোয়ারী ঠাকুর দেখাতে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। বাগবাজার সার্বজনীন মাঠে হারিয়ে এসেছেন বউয়ের দামী নেক্‌লেস্! রাত তিনটের সময় আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে ঘনশ্যামবাবুর সে কি হাপুস নয়নে কান্না! বোধ করি ছেলে মরলেও মানুষ অমন করে চোখের জল ফেলে না!

কি ব্যাপার? না, বউয়ের সেই হারানো নেক্‌লেস খুঁজে-পেতে দিতে হবে। তার মানে— নাক ঘুরিয়ে বলা যে, ওটা তোমরাই সরিয়েছ, এখন ফেরত দিতে হবে! আমরা যেন বিশ হাত জলের তলায় পড়লাম!

সে কি রে বাবা! নেক্‌লেস হারিয়েছে বাগবাজার সার্বজনীন পূজোর মাঠে··· আমরা কোত্থেকে সেই গয়না এনে দেব? বললাম, পি. সি. সরকারকে খবর দাও, আমরা ম্যাজিক জানি নে।

কিন্তু ঘনশ্যামবাবু কি সে কথা শোনে? অন্দরমহলে তার নতুন বউয়ের কান্না, এদিকে বাইরে ঘনশ্যামবাবুর আর্তনাদ!

আমরা থাকতে পাড়ার একটা লোক এমন ভাবে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে মারা যাবে! তবু একথা বলতেই হবে যে, সেই বউ মরলেও বোধ করি ঘনশ্যামবাবু এত চোখের জল ফেলবে না!

এত কান্নাকাটি ভাল লাগে না।

রাজি হয়ে গেলাম - যেখান থেকে পারি—ওই নেক্‌লেস্ খুঁজে পেতে এনে দেব।

আমাদের স্যাঙ্গাতের দল তো সব পাড়াতেই থাকে। শেষ রাত্তিরে উঠে বে-পাড়ায় গিয়ে তাদের খোশামুদি শুরু করে দিলাম। পটলা, গনশা, ভূতো, হিঙ্কে…সবাইকার হাতেপায়ে ধরতে শুধু বাকি রেখেছিলাম। অবশেষে সেই নেক্‌লেস্ বেরুলো নিকাশীপাড়ার এক বস্তির ভেতর থেকে। ভাগ্যিস রাতারাতি ওরা স্যাক্‌রাকে দিয়ে গালিয়ে ফেলে নি! যে স্যাঙাত নিয়েছিল তার বড্ড ঘুম পেতে ওটা বালিশের মধ্যে গুঁজে রেখে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই তো জিনিসটা পাওয়া গেল।

নেক্‌লেস্‌টা ফিরিয়ে দিয়ে ঘনশ্যামবাবুর নতুন বউকে বললাম, ঠাকরুণ, আর এমন করে গয়নাগাটি পরে রূপ দেখাতে বেরিও না। ঘরের গয়না ঘরেই থাক, আমরাও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি। তোমরা হারাবে আর আমাদের ঘাড়ে দোষ পড়বে…হাজার হোক পাড়ার তো একটা ইজ্জৎ আছে! সেটাকে আমাদের বাঁচিয়ে চলতেই হবে।

কিন্তু ওই ঘনশ্যামবাবু এমন নেমকহারাম…কথা ছিল একদিন পাঁঠার ঝোল-ভাত খাওয়াবে, কিন্তু গয়না পেয়ে আর টু শব্দটি করলে না। নেহাৎ পাড়ার লোক তাই কিছু বললাম না, বে-পাড়ার লোক হলে একেবারে ভুড়ি ফাঁসিয়ে দিতাম!

আর এক দিনের কথা বলি শোনো। রবিবার সন্ধ্যেবেলা। বেশ জাঁকিয়ে আমাদের আড্ডা বসেছে রকের ওপর। আসছে তেলে-ভাজা, চপ, বেগুনি, পাঁপরভাজা, তেলমুড়ি। খুব জমে উঠেছে রকবাজী। এমন সময় একেবারে সব মাটি করে দিয়ে পাড়ার গোবর্ধন কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির।

ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

ডাইং ক্লিনিংএ শ্রীমান গরদের পাঞ্জাবি ধোলাই করতে দিয়েছিল। রোজই বলে, আজ দেব কাল দেব। এখন জানা গেছে সেই গরদের পাঞ্জাবি গেছে হারিয়ে। শ্বশুরবাড়ির দেওয়া সেই পাঞ্জাবির মায়া তো বড় কম নয়। গোবর্ধন চোখ গরম করে দাম চায়। তার উত্তরে ডাইং ক্লিনিংএর মালিক হুমকি দিয়ে বলেছে – এক পয়সা দেব না। রসিদের তলায় নাকি লেখা আছে যে, হারিয়ে গেলে বা পুড়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। তবু গোবর্ধন জোর করে বলেছিল, দাম

দিতেই হবে। তখন ডাইং ক্লিনিংএর লোকেরা গরম ইস্তিরির ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে ওর গায়ে। গোবর্ধন হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে, তোরা পাড়ায় থাকতে আমার এই হেনস্তা? আমার হকের ধন হারিয়ে দিল, বলে, দাম দেব না, তার ওপর গরম ইস্তিরির ছ্যাঁকা? এতেও কি তোদের রক্ত গরম হয় না?

সত্যি কথাই তো!

পাড়ার একটি ছেলের এই দুর্গতির কথা শুনে আমাদের বুকের রক্ত অবধি গরম হয়ে ওঠে, আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ! তখনও কি আমরা পাঁপড়ে কামড় দেব আর তেল মুড়ি চিবুবো?

হৈ-হৈ করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম।

চুল ধরে টেনে নামিয়ে আনলাম সেই ডাইং ক্লিনিংএর মালিককে। যেমন ধোলাই দিয়েছিল গরদের পাঞ্জাবি,—তার চাইতেও বেশি করে মোলায়েম ধোলাই লাগালাম।

তখন বাপ-বাপ করে বললে, দিচ্ছি দিচ্ছি, একটু সবুর করো ব্রাদাররা! তবে কি জানো, নগদ টাকা বের করে দিতে পারব না। তার চাইতে আর একটি তসরের পাঞ্জাবি নিয়ে যাও—

গোবর্ধন ফোঁস করে উঠে বললে, না না, আমার গরদের পাঞ্জাবিই চাই।

তখন আমরা ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ওরে অত রাগ দেখাস নে, সবই তো চলে যাচ্ছিল। এখন পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনাই লাভ!

গোবর্ধন বললে, বা রে! গরদের পাঞ্জাবিটা যে আমার শালীর হাতের তৈরী ছিল।

আমি বললাম, পাঞ্জাবিই না হয় গেছে! কিন্তু শালী তো জলজ্যান্ত বেঁচে আছে। তাকে দিয়ে আর একটা পাঞ্জাবি তৈরি করিয়ে নিলেই হবে। এমন সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে!

গোবর্ধন তখন সোনামুখ করে সেই তসরের পাঞ্জাবি নিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

সেবার বর্ষাকালে—শ্রাবণ মাসের একটি রাত্তিরের কথা কখনো ভুলতে পারব না।

কুঞ্জ মিস্ত্রীর বুড়ো ঠাকুমার মায়ের দয়া হয়েছে। কদিন থেকেই ভুগছে খবর পেয়েছি। কে বা ওষুধ-পথ্য দেবে, কে বা রাত জেগে পাখার হাওয়া করবে? বস্তির এক কোণে চটের ওপর পড়েছিল। তাতে অবিশ্যি কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু বুড়ী বিপদ ঘটাল একদিন রাত্তির দুটোর সময়। কুঞ্জ মিস্ত্রীর কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে।

কিন্তু বস্তির কান্না-কাটিও যে একেবারে থামে না! দুপুর রাত্তিরে কানের কাছে এমন ভ্যানর-ভ্যানর ভাল লাগে কখনো? যদিও বৃষ্টিটা বেশ মজাসে ঘুমোবার মতই। কিন্তু বৃষ্টির কান্নার চাইতে মানুষের বাচ্চাদের কান্নাই আমার ঘুমটা বেশি করে চটিয়ে দিলে। বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলাম না, চট্ করে উঠে ভাঙা ছাতাটা মাথায় দিয়ে গিয়ে হাজির হলাম পাশের বস্তিতে।

বুড়ো ঠাকুমা মারা গেছে। কুঞ্জ মিস্ত্রী সেদিন বাড়িই ফেরে নি! কে জানে কোথায় তাড়ি গিলে পড়ে আছে! তাই ছেলেপিলেরা ঘরে মরা নিয়ে ভারী ভয় পেয়েছে।

বাধ্য হয়ে আবার সেই ছাতা নিয়ে পাড়ায় বেরুতে হ'ল।

কিন্তু মুস্কিল বলে মুস্কিল!

কড়া নাড়লে কেউ সাড়া দেয় না!

ঘরের ভেতরে কথা শোনা যায় ফিস-ফিস, কিন্তু দোর খোলবার নাম নেই! জেগে থাকলে কে জাগাবে বলো? কথা বলবে যে—পাত কাটবে সে! দু-একজন ভুলে সাড়া দিয়েছিল, তারা বৌয়ের বুদ্ধিতে বলে দিলে, প্রতিবন্ধক আছে!

অনেক কষ্টে আমরা চারটি প্রাণী ওই বসন্তের মড়াকে নিয়ে গেলাম কাশী মিত্তিরের ঘাটে। একদিন যাদের দাঙ্গার হুমকি থেকে বাঁচিয়েছিলাম, সেই দোতালা-তেতালার কর্তারা একবার উঁকি মেরেও দেখলে না!

হায় রে পোড়া কপাল ! এই পাড়ার জন্যে আমরা ভেবে মরি, তার ইজ্জৎ বাঁচাবার চেষ্টা করি !

আমার এ পাঁচালী আর শেষ হবে না। বলতে গেলে অনেক কথাই জিবের ডগায় এসে যায়। তাতে শুধু তোমরা চটবেই, কোন কাজ হবে না তাতে !

তাই তো, শুধোই তোমাদের, তোমরা মিটিং করো, ছোটদের দিয়ে কবিতা বলাও, গান গাওয়াও। এই তো সেবার ছেলেরা রবিঠাকুরের কবিতা মুখস্ত বললে :

"তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ
আমি আজ চোর বটে !"

সত্যি, পাড়ার জন্যে এত সহ্য করে আমাদেরও ওই একই প্রশ্ন।

আচ্ছা, তোমরা বলতে পার, আমাদের রকের ওপর তোমাদের এত বিষ-দৃষ্টি কেন ?

ভাগ্য-রেখা

[অবিকল সিনেমা-কাহিনী]

বাইরের সাইনবোর্ড দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রতিষ্ঠানটির নাম "মহাবীর ব্যায়ামাগার"। ভেতরে চলছে ডন, কুস্তি আর বক্সিং। হঠাৎ পুলিসের বাঁশী বেজে উঠল। ব্যায়াম-বীরদের মধ্যে উঠল "পালা-পালা" রব। ব্যায়ামাগারের পেছনে পুলিস লেগেছে। অধ্যক্ষ ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ি পাঁচিল টপকে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়বার মুখে একেবারে একজন পথিকের ঘাড়ে! দুজনেই মারমুখী হয়ে উঠেই ফিক্ করে হেসে ফেল্লে।

ঘটোৎকচ বল্লে, আরে, ভাগ্যদাস, কবি, তুমি!

ভাগ্যদাস বল্লে, কি আশ্চর্য্য! ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ি তুমি? প্রাণভয়ে পালাচ্ছ? দুই বন্ধু গিয়ে এক নির্জ্জন জায়গায় বসলে। ঘটোৎকচ জানালো যে, দেশের ছেলেদের ন্যাকা-ন্যাকা কথা আর কুঁজো হয়ে চলা সে সইতে পারে না। তাই প্রতিষ্ঠা করেছে মহাবীর ব্যায়ামাগার। উদ্দেশ্য ছিল তরুণ সম্প্রদায়কে 'বীর' করে তুলবে। কিন্তু পুলিস পেছনে লেগেছে। এখন কি করা যায়! ভাগ্যদাস বুদ্ধি দিল—ব্যায়ামাগারকে রঙ্গমঞ্চ করে তুলতে। গরম-গরম অ্যাক্টিংএর ভেতর দিয়ে দেশের লোকের মনোবল বাড়িয়ে দিতে হবে। কথাটা ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ির মনে ধরল।

ঘটোৎকচ বল্লে, উত্তম প্রস্তাব। তুমি একটি নাটক লেখ, তার নাম হবে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। দুই বন্ধু বিদায় নিলে।

ভাগ্যদাস কলকাতা অঞ্চলের নামকরা কবি। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে পথে চলছে। সকলের মুখেই তার গান—আলুওয়ালা, পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, গাড়োয়ান সবাই তার গান গাইতে গাইতে চলেছে। হঠাৎ

পাড়ায় এসে সে থমকে দাঁড়াল তার রচা-গান গাইছে বিখ্যাত ব্যবসায়ী মুস্কিলেশ্বরের একমাত্র ভাগ্নী ও সম্পত্তির মালিক সুন্দরী তরুণী রেখা। গরীব ভাগ্যদাসের কাছে রেখা আকাশের চাঁদ। তার মুখে কবি নিজের গান শুনে পুলকিত হয়ে ওঠে। পরিচয়ের জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা মনের কোণে উঁকি মারে।

ভাগ্যদাস খবর নিয়ে জানতে পারে যে, ব্যবসায়ী মুস্কিলেশ্বর রায়ের জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস। প্রতিদিন ভাগ্যগণনা না করে বাড়ির বার হয় না! ভাগ্যদাস দেখলে স্বর্ণ সুযোগ। জ্যোতিষের ছদ্মবেশে তার বাড়ির সামনে গিয়ে হাঁক দিলে—"ভাগ্য-রেখা গণনা করি, ব্যবসায় শুভদিন দেখে দি—।"

তরুণী রেখা নামকরা শিল্পী। দিনরাত ছবি আঁকা নিয়ে মশগুল। একটি নতুন ধরনের মডেলের আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। জ্যোতিষীর চেহারা দেখে ভারী পছন্দ হ'ল। বাচ্চা পরিচারিকা চিংড়িকে দিয়ে ডেকে পাঠালো জ্যোতিষীকে। জ্যোতিষী এতটা আশা করে নি। ভেবেছিল দেবী দর্শনের আগে দ্বারের পাণ্ডাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। এ যে সরাসরি মন্দিরে প্রবেশ। গরীব ভাগ্যদাস হকচকিয়ে যায়! ছবি আঁকবার সময় রেখা গুন-গুন করে ভাগ্যদাসের গান গায়। ভাগ্যদাস একথা বলতে সাহস পায় না যে, রেখার মুখের গান তারই রচনা। এমন সময় মুস্কিলেশ্বর সেই ঘরে ঢুকে একজন জ্যোতিষী দেখে ভারী খুশী হয়। নতুন একটা ব্যবসায়ে হাত দেবে, তার শুভাশুভ গণনা করতে হবে। রেখার আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে জ্যোতিষীকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। মুস্কিলেশ্বরের কাছে জ্যোতিষীর আদর বেড়ে ওঠে। কিন্তু জ্যোতিষী যেখানে যেতে চায় তার ফুরসৎ পায় না।

ইতিমধ্যে মুস্কিলেশ্বরের গৃহে রাহুলালের আবির্ভাব ঘটল। রাহুলাল প্রবাসী বাঙালী। মুস্কিলেরএক বন্ধুর ছেলে। মুস্কিলেশ্বরের বাসনা তার সঙ্গেই রেখার বিয়ে হয়। ওরাও বড ব্যবসায়ী। দু সম্পত্তি এক হয়ে এক বিরাট ব্যবসায়ের সূত্রপাত হোক্। রাহুলাল তোত্‌লা। কথা বলতে আটকে যায়। রেখা তাকে দেখে মুচকি হাসে। রাহুলাল তাতে আরো চটে যায়।

জ্যোতিষী একদিন রেখার কাছে আসছে সিটিং দিতে, মাঝপথে মুস্কিলেশ্বর তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্যে জ্যোতিষী বল্লে, এক্ষুণি আপনার প্রাপ্তি যোগ আছে যদি রাস্তায় বেরোন। মুস্কিল ছাতা নিয়ে বেরোতেই এক খাতকের সঙ্গে দেখা, সে ঋণ পরিশোধ করতেই আসছিল। সদ্য প্রাপ্তিযোগে মুস্কিলেশ্বরের কাছে জ্যোতিষীর কদর আরো বেড়ে গেল।

এদিকে ঘটোৎকচ ঘডঘডি তার ব্যায়ামের দলকে নিয়েই নাট্য-সম্প্রদায় গডে তুলেছে। বেঁটে, রোগা, হ্যাংলা, মোটা - যারা যারা "মহাবীর ব্যায়ামাগারে" দেহচর্চা করতে আসত তাদের জড করেই সম্প্রদায় রূপলাভ করছে। ঘটোৎকচ ঘডঘডি এক-এক জনের ওপর এক-একটি কাজের ভার দিয়ে দিয়েছেন। নীচে তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া গেল ঃ

লোহিত লাহিড়ী—জুল্‌পিওয়ালা দীর্ঘদেহ ব্যক্তি—নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবে।

পটল বটব্যাল—যণ্ডা গোছের লোক—উপনায়কের ভূমিকায় দেখা দেবে।

উপোসী উপাধ্যায়—কাঠির মত চেহারা—নৃত্যের পরিকল্পনা করবে।

হারমনা হালদার - মুখ বিকৃত করে গান গায়—স্বরশিল্পী হবে।

ক্ষীরোদ খাস্‌নবীশ - অনর্গল কথা বলে যায়। প্রচারের দপ্তর তার হাতে গেছে। সব সময়ই কব্রিৎকর্মার ভাব।

নটবর ধর—'সখি ধর ধর' গোছের চেহারা - পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করবে।

মনোহর মোদক—নিজের ভাবেই বিভোর। নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনা করবে।

সবার ওপরে আছে - পরিচালক দোলগোবিন্দ দালাল। নাটকের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছে।

ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ি বুঝতে পেরেছে—মোটা টাকা জোগাড় করতে না পারলে নাটক জম্‌বে না! তাই একজন শাঁসালো ধনীর সন্ধানে ছিল। হঠাৎ রাহুলালের সঙ্গে পরিচয়। নারী-ঘটিত ব্যাপার হবে জেনে রাহুলাল রাজী হয়ে গেল। কেননা রেখার সঙ্গে তার মোটেই জম্‌ছিল না। ঘটোৎকচ ভাগ্য-দাসকে জোর তাগিদ দিলে যে "বীরভোগ্য বসুন্ধরা" নাটক অবিলম্বে চাই।

ভাগ্যদাস এখানে নিজের বেশে আসে, তাই রাহুলাল তাকে দেখে চিনতে পারে না। রাহুলালের কাছ থেকে টাকা পেয়ে নাটকের রিহার্সেল জমে উঠল। ব্যায়ামাগারে এতদিন নারীর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু নাটক করতে গেলে নারীর প্রয়োজন—কাগজে কাগজে নায়িকার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। নানা রকম মেয়ে দেখা করতে আসতে লাগল—কালো, ফর্সা, শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা, মোটা, বেঁটে।

ইতিমধ্যে "মহাবীর ব্যায়ামাগারের" সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হল—"ঘটোৎকচ রঙ্গমঞ্চ"। দেশের যুবকগণ যাতে ঘটোৎকচের মতই বীর্যবান হয়ে ওঠে সেই জন্যেই এই নাম ধার্য করা হ'ল। মিন্‌মিনে নাকিসুরে অ্যাক্টিং এখানে চলবে না। চাই বীররসের অ্যাক্টিং—প্রেম নিবেদনের ব্যাপারেও বীররস পরিবেশন করতে হবে। এ বিষয়ে ঘটোৎকচ মশায়ের অদম্য উৎসাহ। তিনি পরিচালক দোলগোবিন্দ দালালকে সেই রকম উপদেশই দিয়েছেন। মানিনী দেবী নামে এক শিক্ষিতা তরুণীকে নেওয়া হ'ল নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে। আর বাতাসী দাসী নামে একটি মেয়েকে নেওয়া হ'ল উপনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যে। এ ছাড়া আর এক দল মেয়েকে জোগাড় করা হ'ল -নৃত্য-গীতের জন্য। থিয়েটারের রিহার্সেল যখন জমজমাট হবার মুখে তখন ওদিকে আর একটি ঘটনা ঘটল।

জ্যোতির্ষী যাচ্ছিল রেখার ঘরে—মুস্কিলেশ্বর তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিল। তার হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষী মুস্কিলের হাত দেখে বল্লে, অতি শীঘ্রই আপনার স্ত্রী-ভাগ্যে ধন লাভ হবে। মুস্কিল উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তার বিয়ের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা? মুস্কিল বিপত্নীক—কিন্তু বয়েস হয়ে গেছে বলে আর একটা বিয়ের কথা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারে না। জ্যোতিষী তার দুর্বলতা বুঝতে পেরে বল্লে যে, গঙ্গার ধারে সকাল-সন্ধ্যেয় ঘুরে দেখতে দোষ কি? কোন বয়স্থা নারী তো স্বয়ম্বরাও হতে পারে।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা মুস্কিলরাম গাড়ি নিয়ে গেল নদীর ধারে। হঠাৎ দেখতে পেল, একটি বিধবা বর্ষীয়সী মহিলা গঙ্গাস্নান করে ফিরতি পথে রাস্তায়

দাঁড়িয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। মুস্কিলরাম গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল। কারণ জিজ্ঞেস করতে মহিলাটির ঝি বল্লে যে, ঠাক্‌রুণের পোষা বেড়ালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! হঠাৎ কোথায় এইখানে পালিয়ে গেল। ঠাক্‌রুণের বেড়াল-অন্ত প্রাণ। বেড়াল না পাওয়া গেলে ঠাক্‌রুণকে বাঁচানো শক্ত হবে।

মুস্কিলেশ্বর একটা ডাষ্টবিনের তলায় বেড়ালের ল্যাজ দেখতে পেয়ে ওটাকে টেনে বের করলে। ইঁদুরের সন্ধানে ওখানে ঢুকেছিল। বেড়াল পেয়ে মহিলাটি ভারী খুশী। মুস্কিল বল্লে, আসুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। গাড়িতে যেতে যেতে মুস্কিল জানতে পারল, ঠাক্‌রুণের তিন-কুলে কেউ নেই, অগাধ সম্পত্তি। বেড়ালের পরিচর্যা করে দিন কাটে। ঝির হাতে ছিল গঙ্গাজলের ঘটি। তাতে নাম লেখা "আসানী দেবী"। মুস্কিলরাম এই সুযোগে বাড়িটা চিনে এলো।

এদিকে মুস্কিলেশ্বরের বাড়িতে জ্যোতিষী সিটিং দিচ্ছে। রেখা গুন গুন করে গান গায় আর ছবি আঁকে। নিজের গান শুনে জ্যোতিষী-বেশী ভাগ্যদাসও মাথা নেড়ে নেড়ে তাল দিতে শুরু করে। রেখা ধমক দিয়ে বলে, মডেল নড়া-চড়া করলে ছবি আঁকা হবে কি করে? ভাগ্যদাস নিজেকে সামলে নেয়। হঠাৎ রেখা তাকিয়ে দেখে, জ্যোতিষীর দাড়ি খানিকটা সরে গেছে। রেখা বুদ্ধিমতী মেয়ে, আচমকা দাড়ি ধরে টানতেই পরচুলা দাড়ি সব খুলে আসে! রেখা রেগে বলে, নিশ্চয়ই তুমি জোচ্চোর, তোমায় পুলিসে দেব। রিভলভার বাগিয়ে ভয় দেখিয়ে নামাবলীর তলায় জামার পকেট তল্লাস করতেই বেরিয়ে আসে একটি গানের খাতা—তাতে ভাগ্যদাসের নাম লেখা। রেখা কবিকে চিনতে পেরে ফিক করে হেসে ওঠে।

এদিকে গোলমাল শুনে মুস্কিলেশ্বর এসে হাজির। ক্রমাগত দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে রেখা আবার জ্যোতিষীকে পরচুলা দাড়ি পরিয়ে দরজা খুলে দিলে। রেখা মুস্কিলকে বোঝালে যে, জ্যোতিষী তার বিয়ের কথা গণনা করতে চেয়েছিল বলে রেখা রিভলভার দিয়ে তাকে ভয় দেখিয়েছে। বরের অধীনে কোন কালেই সে যাবে না। কারণ বরগুলো সব বর্বর।

ওদিকে ঘটোৎকচ রঙ্গমঞ্চে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতদিন ব্যায়ামাগারে নারীর সম্পর্ক ছিল না বলে কোন গোলযোগই দেখা দেয় নি। এখন নারী সমাগমে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হতে লাগল।

নায়িকা মানিনীকে কেন্দ্র করে চারটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল। প্রধান নায়ক লোহিত লাহিড়ী, উপনায়ক পটল বটব্যাল, রাহুলাল স্বয়ং এবং ভঞ্জন রায় নামে এক বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার মানিনীর প্রেমের প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হল! ভঞ্জন রায় থিয়েটারের একজন হিতৈষী এবং কোন একটি ইংরাজী দৈনিকের সিনেমা-এডিটর।

লোহিত লাহিড়ী বলে, সেই যখন নাটকের নায়ক, নায়িকার ওপর তার দাবী সর্বাগ্রে। উপনায়ক পটল বটব্যাল বলে যে, নায়কের চাইতে তার গায়ের জোর বেশী সুতরাং তার দাবী অধিক। রাহুলাল তোৎলামি করে প্রেম জমাতে চায় কিন্তু মানিনীর কাছে পাত্তা পায় না। ভঞ্জন রায় কেতাদুরস্ত লোক। সিনেমার কাগজে মানিনীর নিত্য নতুন ছবি ছেপে এনে তার প্রসাদ কামনা করে—এই ভাবে প্রেম-দ্বন্দ্ব জটিলতর হয়ে ওঠে।

প্রচার-সম্পাদক ক্ষীরোদ খাসনবীশ বাজারে একটা জর্দা চালাবার চেষ্টায় আছে। সে এসে একদিন মানিনীকে ধরল একটা প্রশংসা-পত্রের জন্যে। মানিনী শিক্ষিতা মেয়ে—পান খায় না। হেসে বল্লে, আমি ত পানের গুণ জানি না, জর্দার প্রশংসা-পত্র কি করে দেব? ক্ষীরোদ খাসনবীশ নাছোড়বান্দা। বলে, আপনি লিখে দিন যে, আপনি পান খেয়ে এই জর্দা খান আর প্রাণে অভিনয়ের প্রেরণা লাভ করেন। আলাদা 'লিপ্‌ষ্টিক' আর ব্যবহার করতে হয় না। কিন্তু মানিনী দেবী কিছুতেই রাজী হয় না।

ওদিকে বাতাসী দাসী এসে গোপনে ক্ষীরোদ খাসনবীশকে ধরে। বলে, আমি পান খাই প্রচুর; আসুন একদিন আমার বাড়িতে বেড়াতে—, আমাদের পাড়ায় আপনার জর্দার বহু গায়েক জোগাড় করে দেব। বাতাসী ক্ষীরোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। কিন্তু প্রচার-সম্পাদক ক্ষীরোদ খাসনবীশ বিশেষ আমল দেয় না।

মাঝে মাঝে ভাগ্যদাস নাটকের রিহার্সাল দেখতে আসে। উপনায়ক গিয়ে তাকে ধরে, দেখুন, আমার পার্টে গোটা কয়েক প্রেমের বুলি বসিয়ে দিন। ঝুলি ঝেড়ে সবগুলো ভালো ভালো কথা যে নায়ককেই দিয়ে দিয়েছেন! উপনায়ক কি নাট্যকারের ত্যাজ্যপুত্র নাকি? আর তা ছাড়া বীরভোগ্যা বসুন্ধরা যখন—নায়িকাকে তো আমিই পাব। আমার গায়ের জোর বেশী।

নৃত্যের মহলা চলে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে যে যার সুবিধে খোঁজে। নাটকের নায়ক লোহিত লাহিড়ী প্রচার সম্পাদককে বলে, দেখুন, আমার নামটা বড় টাইপে ছাপবেন, আমি হচ্ছি নাটকের নায়ক।

ব্যারিষ্টার ভঞ্জন রায় গরীবদাসকে কানে-কানে বলে, দেখুন মানিনীর আর দুটো গান বাড়িয়ে দেবেন। এজন্য আমি নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে আপনাকে একটি সোনার কলম দেব। রাহুলালও যেন কি বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তোতলামির জন্য সব কথা জিবের ডগায় এসে আটকে গেল।

নৃত্যশিল্পী উপোসী উপাধ্যায় ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার রোগী; মহলার ফাঁকে ফাঁকে "কোষ্ঠ শুদ্ধি মোদক" খায় আর নাচের 'পোজ' দেখায়। সুরশিল্পী হারমনী হালদার চোখ বুঁজে, মুখ বিকৃত করে তান ধরে, নাচের মেয়েরা দেখে হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। এই ভাবে রিহার্সেল এগিয়ে চলে।

শহরের আর এক দিকে মুস্কিলেশ্বর ঘন ঘন আসানী দেবীর বাড়ি যাতায়াত শুরু করে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, আসানী মুস্কিলের দিকে ফিরেও তাকায় না! দিবারাত্র বিড়ালের পরিচর্যা নিয়েই ব্যস্ত। ঝিকে দু-এক টাকা বখশিশ দিয়ে কথা বের করবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রায়ই ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়। বাধ্য হয়ে মুস্কিল আসানী দেবীর বাড়ির উল্টো দিকে একটা ঘর ভাড়া করে একটা অফিস খুলে বসল।

এদিকে ভাগ্যদাস আর রেখার প্রেম বেশ ঘনীভূত হয়ে এসেছে। এ ব্যাপারটি জানে ভাগ্যদাসের ছোকরা চাকর লাউ আর রেখার পরিচারিকা চিংড়ি।

রেখা রসিকতা করে লাউ-চিংড়ির একটা গান পর্যন্ত বেঁধে ফেলেছে।

"ঘটোৎকচ রঙ্গমঞ্চের" পরিচালক দোলগোবিন্দ দালালের মনে এতটুকু শান্তি নেই। কেননা তার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে রেষারেষি লেগেই আছে। একদিন নায়িকা মানিনী এসে বল্লে, সে কিছুতেই নায়কের পা টিপতে পারবে না, কারণ নায়কের চাইতে সে বেশী মাইনে পায়, সুতরাং নাট্যকার যেন অবিলম্বে নাটক বদলে দেয়। নায়ককে নিয়েও মহাবিপদ! কেননা সে তার বিরাট গোঁফ্ আর জুল্‌ফি কিছুতেই কামাবে না। অথচ নাটক হচ্ছে পৌরাণিক।

উপনায়ক পটল বটব্যালকে নিয়ে আবার আর এক সমস্যা। সেদিন সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাক ও জুতোর জন্যে মাপ নেয়া হল। উপনায়ক এসে বল্লে পরিচালক মশাই, আমার জন্যে এক জোড়া পাম্পসু'র অর্ডার দিন। পরিচালক অবাক হয়ে জবাব দিলে, সে কি! পৌরাণিক নাটক, তুমি পাম্পসু চাইছ কি বলে? পটল বটব্যাল বল্লে, আরে মশাই, তবে গোপন কথা শুনুন। সামনেই আমার শালার বিয়ে, একজোড়া নতুন জুতো না কিনলে শ্বশুর-বাড়িতে সম্মান থাকে না! আরে মশাই, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন কি? এমন অ্যাক্টিং করব যে সবাই চমকে যাবে—আমার পায়ের দিকে তাকাবার ফুরসতই পাবে না। অথচ ওই জুতোতে আমার ভদ্রতা রক্ষাও হবে।

এই জাতীয় অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় পরিচালক দোলগোবিন্দ দালাল মশাইকে।

ওদিকে মুস্কিলেশ্বরের বড় ইচ্ছে জ্যোতিষীকে দিয়ে হাতটা দেখিয়ে নেয় যে, আসমানী দেবীর সঙ্গে তার বিয়েটা সত্যি ঘটবে কিনা! কিন্তু আজকাল জ্যোতিষী যেন একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে! তার দেখা পাওয়াই যায় না। রেখার ঘর থেকে মাঝে মাঝে গানের স্বর ভেসে আসে বটে, কিন্তু দরজা খুললেই সব হাওয়া! রাহুলালের বড় ইচ্ছে যে, নিরিবিলিতে রেখার সঙ্গে একটু প্রেমালাপ করে। কিন্তু দিনরাত্তির দরজা বন্ধ করে এত কি ছবি আঁকা বাপু! আর ছবি আঁকতে বসে এত গানেরই বা ঘটা কিসের?

মুস্কিলেশ্বর একদিন হঠাৎ সিঁড়ির মুখে জ্যোতিষীকে পাকড়াও করে ফেল্লে। মুস্কিলেশ্বর তার দুঃখের কাহিনী বলে ডান হাতটি এগিয়ে দিলে। জ্যোতিষ

জবাব দিলে—TRY—TRY—TRY AGAIN! জানেন তো—

"জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার—
হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।"

জ্যোতিষের কথায় মুস্কিলেশ্বরের মনে আবার উদ্দীপনা জাগল, সে আবার ওই মন্ত্র জপ করতে করতে আসানী দেবীর বাড়ি গিয়ে হাজির হল। দেখে, আসানী একমনে তার পোষা বেড়ালকে চিংড়ি মাছ ভাজা খাওয়াচ্ছে। মুস্কিল দেখলে এই মহা সুযোগ। আসানীকে পেয়ে বসল। বল্লে, বিধবার বাড়ি চিংড়ি মাছ ভাজা! হয় তুমি আমায় তোমার অভিভাবক করে নাও—নইলে আমি পাড়ায় রটিয়ে বেড়াবো যে, তুমি বিধবা হয়েও লুকিয়ে লুকিয়ে চিংড়ি মাছ ভাজা খাও।

আসানী বুঝলে এই লোকটিকে হাতে রাখা দরকার। তা ছাড়া সম্পত্তির আদায়পত্রের জন্যেও তো কাজের লোকের প্রয়োজন। বিনে পয়সায় এমন লোককে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এই থেকে আসানীর বাড়ি মুস্কিলের যাতায়াত ঘন ঘন হতে লাগল। আজ গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া, কাল কালীঘাট দর্শন করানো, পরশু দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণ—এই ভাবে ওদের ঘনিষ্ঠতা অগ্রসর হতে লাগল। একদিন মুস্কিল তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বেড়ালটাকে তাড়াতে গিয়েছিল, কিন্তু আসানী মারমুখো হয়ে বলেছে যে, বেড়ালকে তাড়ালে এ বাড়ির দরজা তার কাছে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে। সেই থেকে মুস্কিল ভয়ে ভয়ে আছে।

রেখা একদিন জ্যোতিষীকে ঠাট্টা করে বল্লে, হ্যা গনক ঠাকুর, তুমি তো রাজ্যি শুদ্ধু লোকের ভাগ্যরেখা বিচার কর—আমার ভাগ্যরেখা বিচার করে আমার ভাগ্য গণনা করতে পার? বেচারী কবি গলে জল হয়ে বল্লে, দেখি তোমার হাতটা! রেখা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে জবাব দেয়, উঁহু! আমি কাউকে পানি গ্রহণ করতে দেব না। রেখার গানে কবি হাবুডুবু খেতে থাকে।

এদিকে ঘটোৎকচ রঙ্গমঞ্চে মানিনীর প্রেম নিয়ে রাহুলাল, লোহিত লাহিড়ী, পটল বটব্যাল ও ভঞ্জন রায় হাবুডুবু খাচ্ছে। রাহুলাল মানিনীকে 'প্রেজেণ্ট' দিয়ে প্রেম জমাতে চায়, কিন্তু তার তোতলামো সব কাজ পণ্ড করে দেয়। নায়িকা

যখন প্রেমের গান গায় তখন চার জনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় কাকে উদ্দেশ করে মানিনী গানটি গাইছে! নায়ক বলে, আমি নাটকের নায়ক—আমার উদ্দেশ্যেই গান। উপনায়ক বলে, অবৈধ প্রেম মিঠে বেশী। গাইছে আমাকে মনে করে। ভঞ্জন রায় বলে,—এ হচ্ছে শ্রীরাধার কলসী করে যমুনায় জল আনা। জটিলা-কুটিলাকে ফাঁক দিয়ে রাধা শ্রীকৃষ্ণকেই চায়। রাহুলাল কি যেন বলতে যায় কিন্তু তোতলামো বাধা দেয়।

চার জনে এক সঙ্গে হো-হো করে হেসে ওঠে।

ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ির টাকার দরকার। সুতরাং সে রাহুলালকে আশ্বাস দেয় যে, মানিনী তার অঙ্কলগ্নী হবেই। কেউ সে পথ রোধ করতে পারবে না। এই ভাবে রঙ্গমঞ্চের তহবিল সে ভর্তি রাখে।

ইতিমধ্যে প্রচারসচিব ক্ষীরোদ খাসনবীশ যখন দেখলে যে, নায়িকার কাছে ভিড় অতি বেশী আর বাতাসীর আন্তরিকতাও কম নয়—তখন সে আস্তে আস্তে ওই দিকেই ঢলে পড়ল। বাতাসীর চেষ্টায় তাদের অঞ্চলে প্রচারসচিবের জর্দার বিক্রীও হু-হু করে বেড়ে যেতে লাগল। প্রচারসচিব বাতাসীকে এই আশ্বাস দিয়েছে যে, প্রচারের জোরে সে উপনায়িকাকে অতি শীঘ্রই নায়িকার আসনে তুলে দেবে। বাতাসীও আজকাল পানে ঠোঁট দুটি টুকটুকে করে ঘন ঘন জর্দা খায় আর সকলের কাছে জর্দার গুণ-কীর্তন করে বেড়ায়। ক্ষীরোদ খাসনবীশ—বাতাসীর Publicity officer—কি বাতাসী খাসনবীশের প্রচার-সচিব সেটা বলা শক্ত!

সম্প্রতি রাহুলাল রেখাকে বিয়ে করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ থিয়েটারের পেছনে নিজের টাকা ঢেলে সে প্রায় ফতুর—রেখাকে পেলে অনেকটা সামলে নিতে পারে। রেখা বা মানিনী কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না—এ কি তার কম বেদনা? মুস্কিলেশ্বর রাহুলালের আগ্রহ দেখে বলেছে যে, জ্যোতিষী ঠাকুর রাজ-জোটক বিচার করে দিলে তার আর কোন আপত্তি নেই। তাই একদিন রাহুলাল তার নিজের আর রেখার ঠিকুজী নিয়ে রেখার সামনেই বল্লে, জোটক বিচার করতে হবে।

আপনভোলা জ্যোতিষী মাথা নেড়ে বল্লে, এ একেবারে রাজজোটক।—ভাবী বধূর সঙ্গে এতটুকু মতের অমিল হবে না আপনার। রেখার এইবার অভিমান হয় ভাগ্যদাসের ওপর। এই মুখচোরা লোকটি কি কখনই তার মন বুঝবে না? সে-ও মুখভার করে রাহুলাল আর ভাগ্যদাসের সামনে বলে, রাজ-জোটক যেখানে হবে সেইখানেই তো বিয়ে বসা উচিত।

ভাগ্যদাস তখন সত্যি নিজের ভুল বুঝতে পারে। তারপর আপন মনে ভাবে—বড লোকের মেয়ে বড় লোকের ঘরণী হবে এইটেই তো স্বাভাবিক। সে গরীব তাই রেখা এতদিন তাকে নিয়ে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছিল। নিঃশব্দে সে চলে আসে।

এই ভাবে দুজনের মধ্যে একটা বিরহের সেতু গড়ে ওঠে। ওদিকে ঘটোৎকচ-রঙ্গমঞ্চে—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরার" উদ্বোধন রজনী। রাহুলাল মনে মনে ভাবে বসুন্ধরা তো বীরভোগ্যাই। রেখাকে লাভ করার উপায় করা গেছে, এইবার মানিনীর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সামনা-সামনি সে প্রেমালাপ করতে পারে না। কিন্তু মানিনীর সঙ্গে প্রেমালাপ তাকে করতেই হবে। তার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। নায়কের পার্টে অনেক ভালো ভালো, বাছাবাছা প্রেমের কথা আছে। রাহুলাল ঠিক করলে, প্রথম অভিনয় রজনীতে নায়ককে কোন রকমে তার বাসায় আটকে রাখতে হবে। এজন্য সে পাষণ্ড গুণ্ডা নামে কালীঘাটের একটি একটি গুণ্ডাকে নিযুক্ত করলে। ড্রেসার তো তার হাতের লোক। তাকে কিছু বকশিশ দিয়ে সে নিজে নায়ক সেজে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলে। তারপর যেই মানিনীর সঙ্গে প্রেমালাপ শুরু করতে যাবে—অমনি আরম্ভ হল তোতলামি! দর্শকদল হৈ-হৈ করে উঠল, মানিনী মঞ্চের ওপর মূর্ছা গেল—বেগতিক দেখে ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ি ড্রপ ফেলে দিয়ে কোন রকমে নিজের প্রাণ বাঁচায়!

অন্যদিকে মুস্কিলেশ্বর আসানী-ধ্যানে মগ্ন। দিনরাত সে তার উল্টোদিকের অফিসেই থাকে। বেড়ালের আদর দেখে তার মনে ঘেন্না ধরে গেছে। মুস্কিলে-শ্বরের সম্প্রতি একটি মুদ্রাদোষ হয়েছে—থাকে থাকে—নিজেই মিউ মিউ করে ডেকে ওঠে। হয়তো অন্যান্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছে, হঠাৎ ডেকে উঠল

'মিউ'! সবাই অবাক হয়ে ভাবে—লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

ইতিমধ্যে রাহুলালের সঙ্গে রেখার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। মুস্কিলেশ্বরও রেখার বিয়ে দেবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত। কেননা এদিক থেকে দায়মুক্ত হতে না পারলে নিজের ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে উঠতে পারছে না। সে জ্যোতিষীকে ধরেছে যে, রেখার বিয়েতে তাকেই পৌরোহিত্য করতে হবে। মুখচোরা ভাগ্যদাস তাতেই রাজী হয়েছে।

লাউ আর চিংড়ি গোপনে কেবলি পরামর্শ করছে, কি করে একটা উপায় বের করা যায়!

রাহুলাল কিন্তু রেখা আর মানিনী কাউকেই ছাড়তে রাজী নয়। ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ি আশ্বাস দিয়েছে যে, বিয়ের দিন লগ্ন অনেকক্ষণ আছে। কাংদা করে দুটো বিয়েই একদিনে সমাধা করে দেয়া হবে।

এই উদ্দেশ্যে রাহুলালের বিয়ের রাত্রে ঘটোৎকচ-রঙ্গমঞ্চ "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" অভিনয় করবে—এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশী রাত্রে লগ্ন। বরযাত্রী কন্যাযাত্রী সবাই ভোজন সমাপন করে থিয়েটার দেখতে সমবেত হয়েছে। রাহুলাল নিজেও উপস্থিত।

ওদিকে রেখা কনে সেজে বসে আছে। হঠাৎ চিংড়ি এসে তার কানে-কানে কি বল্লে। দুজনে গোপনে কি পরামর্শ করে চাদরে গা ঢেকে গরীবদাসের কুটিরে গিয়ে হাজির হল। সেখানে দেখা গেল, কবি নিজের গানের পুঁথিগুলি পুড়িয়ে ফেলছে। রেখা বল্লে, তুমি এ কি করছ কবি?

কবি বল্লে, এর চিহ্ন রাখব না, তারপর তোমার বিয়েতে গিয়ে পৌরোহিত্য করব। রেখা ম্লান হাসি হেসে বল্লে, আগুনেই কি ওরা নিশ্চিহ্ন হবে? সব যে আমার কণ্ঠে বাসা বেঁধেছে। এই বলে রেখা কবির লেখা একটি গান গাইলে। কবির চোখে জল। কবি বল্লে, তোমার মামার কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তোমাদের বিয়েতে আমি পৌরোহিত্য করব। সে লগ্ন এখনো ফুরোয় নি।

রেখা উৎফুল্ল হয়ে বল্লে, হ্যাঁ কবি, আমাদের জীবনের শুভলগ্ন এখনো উত্তীর্ণ হয় নি—এসো তুমি আমার সঙ্গে। কবিকে নিয়ে রেখা দ্রুতপদে চলে গেল।

অন্যত্র দেখা যাচ্ছে - মুস্কিল সন্ধ্যে থেকে নিজের অফিসে মনমরা হয়ে বসে আছে। বেড়ালের হাত থেকে কি তার কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই ? নিজের বাড়িতে বিয়ে—সেখানে যাবারও তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না! হঠাৎ হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আসানী তার কাছে এসে উপস্থিত। মুস্কিলেশ্বর হাসবে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারল না! বল্লে, তোমায় এমন করে কাঁদতে দেখলে আমিও যে কেঁদে ফেলব আসানী।

আসানী বল্লে, আমার মেনী বেড়াল আমায় ফাঁকি দিয়ে আজ দুদিন পালিয়ে গেছে। 'মুস্কিল বল্লে, বল কি আসানী ? আসানী বল্লে সে রোজ আমার বুকের কাছটিতে শুয়ে থাকত। মুস্কিল বল্লে, সত্যি ? আসানী বল্লে, রোজ আমার গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে দিত। মুস্কিল বল্লে, অ্যাঁ! বল কি ? আসানী বল্লে, রোজ আমার পাতের দুধভাত চেটেপুটে খেতো। মুস্কিল বল্লে, কি আশ্চর্য আসানী!

আমানী বল্লে, মেনীকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব ? মুস্কিল সাহস পেয়ে বল্লে, তা যদি ভরসা দাও তবে—

আসানী বল্লে, তার জন্যে সারাদিন দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটি নি! মুস্কিল উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলে, আমিও আসানী—আমিও উপোস করে আছি। যদি বল একজন পুরুতকে ডাকি! আসানী ঘাড় কাৎ করলে। মুস্কিল তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে—

ওদিকে মুস্কিলের অন্দরমহলে গোলমাল—কনেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরের মহলে খবর তখনো গিয়ে পৌঁছয় নি। সেখানে সবাই থিয়েটার দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে বসে আছে। হঠাৎ পর্দা ঠেলে সামনে বেরিয়ে এলো ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ি। দর্শকবৃন্দকে উদ্দেশ করে বল্লে, আজ আপনাদের কাছে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা আছে। ইতিপূর্বে "মহাবীর ব্যায়ামাগার"—"ঘটোৎকচ রঙ্গমঞ্চে" রূপান্তরিত হয়েছিল। আজ আবার শুভলগ্নে সেই রঙ্গমঞ্চ "পাইকারী প্রজাপতি অফিসে" পরিণত হচ্ছে। লগ্ন শুভ, আমাদের কাজ ইতি-মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তাই আপনাদের কয়েকটি নমুনা দেখিয়ে দি—

ঘড়ঘড়ি মশাই নিষ্ক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা উঠে গেল। কনসার্ট বেজে

উঠল, দেখা গেল—

মুস্কিলেশ্বর আর আসানী দেবী জোড়ে যাচ্ছেন—পর্দায় প্রতিফলিত **হল—**

মুস্কিল + আসান = **মুস্কিল আসান**

সেই দৃশ্য মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—মানিনী আর **ভঞ্জন রায়** জোড়ে যাচ্ছেন—

পর্দায় প্রতিফলিত হল—

মানিনী + ভঞ্জন = "**মান ভঞ্জন**"

সেই দৃশ্য মিলিয়ে যেতে দেখা গেল —

ক্ষীরোদ খাসনবীশ আর বাতাসী জোড়ে যাচ্ছেন—

পর্দায় প্রতিফলিত হল —

ক্ষীরোদ + বাতাসী = "**ক্ষীর বাতাসা**"

এর পরের দৃশ্যে দেখা গেল —

ভাগ্যদাস ও রেখা গাঁটছড়া বাঁধা

পর্দায় প্রতিফলিত হল—

ভাগ্য + রেখা = "**ভাগ্যরেখা**"

রাহুলাল এতক্ষণ অবাক হয়ে এই সব কাণ্ড দেখছিল। সে নিজের **করতলের** দিকে বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে বল্লে -

"কিন্তু আমার ভাগ্য রেখা ?"

খাবারের লোভে আসানীর পলাতক বেড়ালটা এইখানে এসে **হাজির** হয়েছে। সে রাহুলালের মাথার ওপর লাফিয়ে পড়ে ডাকলে, ম্যা—ও !"

পর্দায় তখন লেখা ফুটে উঠেছে —

"পাইকারী প্রজাপতি অফিস"

ফটোসহ আজই আবেদন করুন।

বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পূজারী—

ঘটোৎকচ ঘড়ঘড়ি

সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়িয়েছে একদিকে লাউ—আর একদিকে চিংড়ি —!

গল্প-লেখকের সাধ্যাযাত্রী

শেষ রাত্তিরে ঘুম এলো গল্প লেখক গঙ্গাধর গায়েনের দুটি চোখে !

ক্রমাগত ছটি মাস বিনিদ্র রজনী যাপন করে গঙ্গাধর গায়েন এই মাত্র একটি বাস্তুহারা মেয়ের করুণ কাহিনী শেষ করেছেন। এই বাস্তব গল্পটির রূপ দিতে গিয়ে তাঁকে বেনাপোল অঞ্চলে বহুকাল ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, সংবাদপত্রের রিপোর্টারের শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন আশ্রয়-শিবির পরিদর্শন করেছেন, অহেতুক বাস্তুহারাদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে চরিত্রহীন ধনী ব্যবসায়ীদের আড়কাঠি বলে গালাগাল খেয়েছেন···কিন্তু কিছুতেই দমে যান নি আমাদের বাস্তবের নিষ্ঠুর পূজারী গঙ্গাধর গায়েন।

এমন একখানি বই তাকে লিখতে হবে যা পড়ে ভবিষ্যৎ সমাজ সমস্বরে বলতে পারে—হ্যাঁ, একখানি "ডকুমেণ্টারী নভেল" হয়েছে বটে।

দিনের পর দিন বাস্তুহারা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেখে বন্ধুরা টিট্‌কিরি দিয়েছে, পুলিশ সন্দেহ করেছে, গৃহের গৃহিণী বাপের বাড়ি চলে যাবেন বলে শাসিয়েছেন, কিন্তু দমেন নি আমাদের সাহিত্যস্রষ্টা গঙ্গাধর গায়েন। ছেলেবেলায় ইস্কুলে তিনি পদ্য (তখনকার দিনে কবিতা বলা হত না) মুখস্থ করেছেন—

"জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার
হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।"

কাজেই আশেপাশের এই সব উপদ্রব ও অসুবিধাকে তিনি আমলেই আনেন নি। সাধনা করতে গেলে বিঘ্ন তো আসবেই। তাকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন ?

বুদ্ধদেব যখন সিদ্ধিলাভের আশায় বোধিদ্রুমের তলায় বসে পড়ে বলেছিলেন—এইখানে আমার শরীর শুকিয়ে যাক্‌···কিন্তু সিদ্ধিলাভ না করে উঠছি না··· তখনই মারের প্রলোভন এসেছিল !

করুক বন্ধু-বান্ধবেরা উপহাস, লাগুক পুলিস পেছনে ফেউয়ের মত, যাক্ চলে গৃহিণী অভিমান করে পিত্রালয়ে…সব ঠাণ্ডা করে দেবেন একদিনে যদি তার উপন্যাস সত্যি বাস্তবধর্মী হয়!

আজ শেষ রাত্রে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন গঙ্গাধর গায়েন। বোধি-দ্রুমের তলায় বুদ্ধদেব কি তার চাইতে শান্তি লাভ করতে পেরেছিলেন? রামকৃষ্ণ দেব সব ধর্ম সমন্বয়ের অন্তর্নিহিত কথা আবিষ্কার করে কি তার চাইতেও গর্ব অনুভব করেছিলেন? নিউটন মাধ্যাকর্ষণের মূল সূত্র পেয়ে কি তার চাইতেও খুশী হয়েছিলেন? কিম্বা কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে তার অপেক্ষা খ্যাতিমান হতে পেরেছিলেন?

পরম নিশ্চিন্তে আর অসীম আরামে গঙ্গাধর একটি বিড়ি ধরিয়ে সুখ টান দিলেন।

তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেলেন—তাঁর লেখা এই "বাস্তুহারা বালিকা" বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে! কাগজে কাগজে উচ্ছ্বসিত সমালোচনা, ক্লাবে সমিতিতে জ্বালাময়ী আলোচনা শহরের দেয়ালে দেয়ালে উদ্ধৃত প্রাচীর পত্রের কথায় বিজলী চমকের মত মনে এলো সিনেমার রূপালী ঝলক!

তাই তো! "বাস্তুহারা মেয়ে" যদি সিনেমায় রূপান্তরিত হয় তবে রাতারাতি বিখ্যাত হবার আর বাকি রইল কি? গায়েন মশায়ের পাশের বাড়িতে এক বিশ্বখাটে ছেলে থাকে, নাম তার ঝলমল মালাকার। সে নাকি কোন কোন বাংলা ছবিতে হাসির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকবৃন্দের বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত করবার কাজে সাহায্য করে থাকে। সিনেমা জগতের বহু স্বনামধন্য পরিচালকের সঙ্গে নাকি তার ওঠা-বসা। এই ঝলমল মালাকারের স্মরণাপন্ন হয়ে সিনেমারাজ্যে প্রবেশের "পাসপোর্ট" সংগ্রহ করতে হবে। বিড়ি টানতে টানতে ঠিক করে ফেললেন গঙ্গাধর গায়েন।

পরের দিন সকালবেলা ঝলমল সব কথা শুনে বললে, আপনার লেখা বই গঙ্গাধরদা! তবে তো আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আপনি খুব ভালো সময়ে এসেছেন। পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশ একটি অভিনব কাহিনী

খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনার "বাস্তুহারা বালিকা" নিশ্চয়ই তাকে খুশী করতে পারবে। আজ সন্ধ্যেবেলা যাবেন আমার সঙ্গে। সব ব্যবস্থা করে দেব।

এত সহজে যে কার্যোদ্ধার হবে গঙ্গাধর গায়েন তা ধারণাই করতে পারেন নি। মনে মনে বাড়ি ও গাড়ির নক্সা ছকতে ছকতে ঘরে ফিরে এলেন এবং কোন্ দেবী তার "বাস্তুহারা মেয়ে"র রূপদান করবেন সেই কথা ভেবে দিবা-স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন।

ঝলমল মালাকারের সময় জ্ঞান আছে বলতেই হবে। সন্ধ্যের ঠিক মুখেই এসে সে গায়েন মশায়ের বাড়ির কড়া নাড়তে শুরু করে দিল।

ঝলমল উপদেশের সুরে শুরু করলে, জানেন তো গঙ্গাধরদা, মহাজনদের মুখের মহাবাণী—

—"আগারী দর্শনধারী
পিছারী গুণ-বিচারী"

তাই বলছিলাম কি, একটু নিউ-টেকনিকে সাজ-পোশাকটা সেরে নিন। আপনি যে নতুন ভাবে চিন্তা করেন, অভিনব কিছু সিনেমা জগতে দান করতে পারেন…এতদিন ইচ্ছে করেই এ রাজ্যে উঁকিঝুঁকি মারেন নি… এমনি একটা "কেয়ার ফ্রি" স্টাইল আর কি! অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে যেতে ভুলবেন না। তাতে থাকবে নানা রকমের রেফারেন্সের নোট। হকৃচকিয়ে দিতে হবে পরিচালককে ‥ বুঝলেন না? তারপর রয়েছে আমার সিদ্ধ-বাক রসনা…এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দেব যে, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না—কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের কথা বলছি!

ঝলমল মালাকারের কথা বলবার ধরণ দেখে গঙ্গাধর গায়েন উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এই রকম একটি মুরুব্বি যদি থাকে তবে চিত্রজগতের বৈতরণী পার হতে আর বেশী বেগ পেতে হবে না।

শিস দিয়ে গান করতে করতে গায়েন মশাই তার রুক্ষ চুলের মধ্যে চিরুনী চালাতে থাকেন।

সন্ধ্যেটা সবে উৎরে গেছে এমন সময় ঝলমল গঙ্গাধর গায়েনকে নিয়ে এলো

পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশের খাস কামরায়। মালাকারের সুপারিশে পরিচালক মশাই আগাগোড়া গল্পটি পাঠ করতে বললেন লেখক মশাইকে। কাজটা সোজা নয়। তবু ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল রজনীর মধুর স্বপ্নের কথা কল্পনা করে গঙ্গাধর গায়েন পাতার পর পাতা পড়ে যেতে লাগলেন। কাহিনী যখন শেষ পাতায় এসে পৌছুলো – তখন বহু প্যাকেট সিগারেট ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে, অনেক কাপ চা উদরে প্রবেশ করেছে, অনেক হাই উঠেছে কারণে-অকারণে এবং স্রষ্টা গায়েন মশায়ের মুখে গ্যাঁজলা বের হয়েছে! অর্ধনিমিলিত নয়নে পরিচালক মশাই ফতোয়া জারি করলেন, হ্যাঁ, আইডিয়াটা মন্দ না! Scanty Dress-এর মারফৎ "বাস্তহারা বালিকা" বেশ খানিকটা Sex appeal-এর সৃষ্টি করতে পারবে। আমি বাংলার সিনেমা জগতে নতুন Bird of Paradise-এর সৃষ্টি করব।

'কমপ্লিমেণ্ট' শুনে গল্পলেখক গায়েন মশাই আঁতকে উঠলেন যেন! ভয়ে ভয়ে মন্তব্য করলেন, আজ্ঞে, আমার "বাস্তহারা বালিকা" তো ঠিক সে স্টাইলের বই নয়, সম্ভ্রম রক্ষার জন্যেই তো সে জীবন দেবে···

একটি সবজান্তা হাসি হেসে পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশ বাঁকা ঠোঁটে ব্যক্ত করলেন, আরে মশাই, "বাস্তহারা বালিকা" যখন আপনার কলম থেকে আমার পোর্টফোলিওতে ঢুকেছে···তখন তার চেহারা বেমালুম বদলে যাবে। জানেন তো বিয়ে দিয়ে দিলে শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের চেহারা কেমন রাতারাতি পাল্টে যায়···হেঁ-হেঁ-হেঁ! ও আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আমি সব ক্লিন ম্যানেজ করে দেব। হ্যাঁ, তবে একটি চিন্তা করার বিষয় আছে "বাস্তহারা বালিকার" রোলটা করবে কে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কপালের ওপরে তর্জনী দিয়ে তিনটে টোকা মেরে পরিচালক মশাই উৎফুল্ল কণ্ঠে উদ্গার করলেন, ঠিক হয়েছে! ইউরেকা! বাঞ্ছিতা দেবীকেই "বাস্তহারা বালিকার" পার্ট মানাবে ভালো!

গল্পলেখকের আশঙ্কার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। গঙ্গাধর গায়েন ভয়ে ভয়ে বললেন, কিন্তু ওঁর বয়েসটা একটু বেশী হয়ে যাবে না? আমার বাস্তহারা মেয়ের বয়স সতেরো বছরের বেশী নয়। কিন্তু মাফ করবেন, শুনেছি বাঞ্ছিতা

দেবী চল্লিশের কম হবেন না!

গল্প-লেখকের কথা শুনে পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশ যেন রাগে ফেটে পড়লেন,—বয়েস! আপনি কোন্ যুগের লোক মশাই? আর্টিস্টের আবার বয়েস থাকে নাকি? উর্বশীর নাম শুনেছেন? আপনাদের রবীন্দ্রনাথ যাঁর নামে কবিতা রচনা করে গেছেন? তার কত বয়স ছিল আপনি অনুমান করে বলতে পারেন? পরে, গলাটা একটু খাটো করে বললেন, দেখুন মশাই আপনাকে একটা সৎ পরামর্শ দি; ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কথায় বলে,

"যার কর্ম তারে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

আবার একটা সিগারেট মুখে গুঁজে দিয়ে তিনি মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন!

বেশী টানা-হ্যাঁচড়া করলে পাছে দড়ি একেবারেই ছিঁড়ে যায় এই ভয়ে গঙ্গাধর গায়েন মশাই আর খুব উচ্চবাচ্য করলেন না!

সেদিনকার মত আলোচনা ওইখানেই শেষ হল এবং পরিচালক মশাই জানালেন, আপনার পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে রেখে যান, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভাবতে হবে কিনা!

তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, ওসব টেকনিক্যাল ব্যাপার আপনারা বুঝবেন না মশাই—Leave it to me.

সেই সঙ্গে খানিকটা দেঁতো হাসি!

গল্পলেখক গঙ্গাধর গায়েন—সাহিত্য জগতে নতুন নন, তার বহু গল্প-সংগ্রহ ও উপন্যাস একাধিক সংস্করণের গৌরব অর্জন করেছে···কিন্তু তা সত্বেও তাঁর গা বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল! বেশ অনুধাবন করতে পারলেন যে, সিনেমা রাজ্যি বড় সহজ ঠাঁই নয়!

ঝলমল মালাকারকে সঙ্গে নিয়ে গায়েন মশাই চলে এলেন। পথে ঝলমল তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, আপনি কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না গঙ্গাধরদা। বইটা তো আগে ডিরেকটারকে গছিয়ে দিন, কিছু মোটা টাকা আগাম আদায় করুন, তারপর আমি তো রয়েছি। কথায় বলে না, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে! সেই শেষ

রাত্তিরের খেল্ দেখাব আমি…এই ঝলমল মালাকার!

এই বলে সে নিজের বুকে তিনটি টোকা মেরে দিলে! বাসে উঠে বেশ আমেজ করে বসে মালাকার বললে, আমার আসল কথাটাই কিন্তু বলা হয় নি দাদা!

গায়েন মশাই তার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইতেই সে ওঁর দুটি হাত ধরে ফেলে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করল, দাদা, আপনার ওই বাস্তুহারা মেয়ের একটি রসালো প্রেমিক জুটিয়ে দিতে হবে। তার কথায় কথায় থাকবে হাসির ফোয়ারা। আর সে পার্ট করব আমি। দেখবেন হাউস কেমন নেয়।

লেখক মশাইকে তখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঝলমল বললে, না না, আপনি ডিরেক্টারের জন্যে কিছু ভাববেন না---সব আমি ম্যানেজ করে নেব।

গঙ্গাধর গায়েন কিন্তু এজন্যে আরো বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লেন! এরা সবাই একযোগে ম্যানেজ করতে চায়…শেষ পর্যন্ত যে শ্রাদ্ধ কোন্ পর্যন্ত গড়াবে সেইটেই হল মস্তবড় ভাবনা!

তবু মনে এই আশা যে, এ বইখানি যদি সিনেমায় রূপলাভ করে, তবে সাহিত্যের সপ্তম স্বর্গে উঠে যাবেন গায়েন মশাই, স্তুতির মালিকা স্তূপীকৃত হবে ওঁর দুই চরণ ঘিরে, গাড়ি-বাড়ির একটা অর্থোচ্ছাবিত আশা সবার অলক্ষ্যে ওঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকবে; আহ্বান আসবে নানা চিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে, কাগজে কাগজে মুদ্রিত হবে তাঁর আলেখ্য!

এই সুখ-স্বপ্নের মূল্য বড় কম নয়। কয়েকদিন ধরে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে থাকেন গল্প-লেখক গঙ্গাধর গায়েন।

চার পাঁচ দিন পর একখানি চিঠি এলো স্বয়ং প্রডিউসারের কাছ থেকে। তিনি লেখকের সঙ্গে দেখা করে একবার আলোচনা করতে চান।

ঝল্‌মল্‌কে সাথী করে গঙ্গাধর রওনা হলেন প্রডিউসারের গৃহের উদ্দেশ্যে।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। সারা জীবন সুগন্ধী তিল তেলের কারবার করে বেশ কিছু পয়সা জমিয়েছেন। তার শ্যালকের পীড়াপীড়িতেই তিনি এই ছবিখানি তুলতে সম্মত হয়েছেন। আসল কথা হচ্ছে, ছবি তুলতে যে টাকা খরচ হবে—তার চারগুণ যাতে ফিরে আসে সেই রকম জোরদার করে গুছিয়ে গল্প লিখতে হবে।

গঙ্গাধর গায়েন বললেন, দেখুন মশাই—

ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে সংশোধন করে দিয়ে উত্তর করলেন, আমার নাম হচ্ছে শিবশম্ভু সরখেল। কাজেই বুঝতেই পারছেন, যতবার আমার নাম উচ্চারণ করবেন আপনারই পূণ্যি হবে। আমার বাপ-মা অনেক ভেবেচিন্তে এই নামকরণ করেছিলেন! আচ্ছা এইবার কি বলছিলেন বলুন—

গঙ্গাধর গায়েন উত্তর করলেন, দেখুন শিবশম্ভুবাবু!

সরখেল মশাই উৎসাহিত হয়ে বললেন, ঠিক! ঠিক! এই রকম ভাবে আমার নাম উচ্চারণ করে কথা বললে তাতে আপনারও পরকালের কাজ হবে আর আমারও দেবতার নাম শোনা হবে।

গঙ্গাধর গায়েন মনে মনে মনে বললেন, কত রকম মানুষই যে এই দুনিয়ায় আছে!

যাক্, সিনেমা জগতে এসে আর কিছু না হোক, নতুন নতুন চরিত্র দেখে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে। আসলে এইটেই লাভ। সাহিত্য সৃষ্টির কাজে পরে এগুলো কাজে লাগবে।

গঙ্গাধর গায়েনকে মুখ ফুটে আর বেশী কিছু বলতে হল না। কেন না, শিবশম্ভু সরখেল মশাই একাই একশ! অনেক ভনিতার পর নিজেই শুরু করলেন তার বক্তব্য। বললেন, দেখুন গায়েন মশাই, আপনারা লেখাপড়া জানা লোক, বাস্তুহারা মেয়ের গল্প লিখেছেন—সে গল্প আমি শুনেছি পরিচালক প্রভঞ্জন শাসনবীশের কাছে। গল্প সম্বন্ধে বলবার আমার কিছুই নেই। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন লাখখানেক টাকা ফেলব এই ব্যবসার পেছনে। তাই ভেবেচিন্তে পা বাড়াতে হবে। শুনুন—

আজ্ঞে বলুন!

আমরা স্বামী-স্ত্রীতে প্রতি রোববার সিনেমা দেখে থাকি। লোকে কি চায় বলুন দেখি?

গঙ্গাধর গায়েন এইবার উৎসাহিত হয়ে উত্তর করলেন, আজ্ঞে ভালো গল্প। যে গল্প মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। তারই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা।

শিবশম্ভু সরখেল মাথা দুলিয়ে উত্তর করলেন, সে তো ঠিকই! সে তো নিশ্চয়ই! তবে কি জানেন সাধারণ মানুষ তো পয়সা দিয়ে ছবি দেখবে, আপনি এক কাজ করুন, আধ আউন্স সুরাইয়ার হাসি, সাড়ে তিন আউন্স মধুবালার চাহনি, চার আউন্স কাক্কুর নাচ, আর সাড়ে পাঁচ আউন্স গীতাবলীর গান বেশ করে পাঞ্চ করে আপনার গল্পের নায়িকাকে তৈরী করে ফেলুন। আপনার ওই বাস্তুহারা মেয়েকে দেখতে সারা কলকাতা শহরের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তখন আমায় আপনিই এসে বলবেন যে, হ্যাঁ শিবশম্ভুবাবু একটা কথার মত কথা বলেছিলেন বটে!

প্রডিউসারের কথা শুনে গল্প-লেখক গঙ্গাধর গায়েনের চোখ প্রায় আলুচেরা হয়ে উঠেছে! শিবশম্ভুবাবু আন্দাজ করে নিলেন যে তার কথাটা কাহিনীকারের মনে ধরেছে। তাই উত্তেজনায় আরো উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, দেখুন, আর একটি কাজের কথা আপনার সঙ্গে কয়ে নি। নায়িকা বাঞ্ছিতা দেবীর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। দশ হাজার টাকা তাকে আমি আগাম দিয়েছি। তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন।

এই বাস্তুহারা মেয়ের দুটি প্রেমিক রাখবেন—তার একজন পূর্ববঙ্গের এবং আর একজন পশ্চিমবঙ্গের। তাদের দুজনের থাকবে ডুয়েট গান। সেই গান শুনতে যে লোকের ভিড় হবে—ট্র্যাফিক পুলিস তা ম্যানেজ করতে হিমসিম খেয়ে যাবে—! আমার কথাগুলি দামী কি না আপনিই ভেবে দেখবেন। আরে মশাই, সুগন্ধী তিল তেলের ব্যবসা করে এত বড় হয়েছি। কার সঙ্গে কি মেশাতে হবে সেটা বেশ ভালো করেই জানি।

একটা উদ্গার তুলে শিবশম্ভু সরখেল বললেন, আজ ভোজনটা বড্ড বেশী হয়েছে। গিন্নী নিজে হাতে রান্না করেছিলেন কিনা—তাই ভাবছি গঙ্গার ধারে একটু বেড়াতে যাব। আচ্ছা, তাহলে আপনি বেশ করে ভেবে গল্পটা চট্‌পট্‌ বদলে ফেলুন। এই বলে সরখেল মশাই তার বিশাল দেহ তুলে ফেললেন।

গঙ্গাধর গায়েনও ঝলমলের কাঁধে ভর দিয়ে কোন রকমে বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন সকালবেলা ঝলমল মালাকার ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বললে, কেল্লা মাৎ।

গায়েন মশাই শুধোলেন, ব্যাপার কি?

ঝলমল মালাকার বললে, আজ থেকেই আপনার বইয়ের স্যুটিং শুরু হচ্ছে। পরিচালক মশাই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুণি আপনাকে নিয়ে স্টুডিওতে হাজির হতে হবে।

তাহলে সুদিন কি সত্যি ফিরে এলো? কৈলাশের অধিপতি শিবশম্ভু তাহলে মুখ তুলে চাইলেন!

দুর্গানাম জপ করে গায়েন মশাই মালাকারের সঙ্গে রওনা হলেন। গায়েন গৃহিণী পাঁচটা পয়সা কপালে ছুঁইয়ে কুলুঙ্গিতে আলাদা করে তেলসিঁদুর মাখিয়ে চিহ্নিত করে রেখে দিলেন। সময়মত সিন্নির ব্যবস্থা করতে হবে।

স্টুডিওতে পৌঁছতেই পরিচালক প্রভঞ্জন খাসনবীশ ছুটতে ছুটতে এলেন।

এই যে গায়েন মশাই এসে পড়েছেন। আমি আপনার জন্যে হাঁ-পিত্যেশ করে বসে আছি। দেখুন, আজকেই আপনার "বাস্তুহারা মেয়ের" শেষ দৃশ্যটা তুলে ফেলছি। মানে মিলনান্তক বই করে দিলাম। আপনার বিয়োগান্ত বই কি আর লোকে নেবে মশাই? এমনিতেই তো লোকে না খেতে পেয়ে চিঁচিঁ করছে। তারপর আর কত কাঁদুনি সইতে পারবে দর্শকদল? তাই দিলাম একেবারে যুগল মিলন করিয়ে। হ্যা, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম! "চাঁদ-চকোরে" গোছের একটা উজ্জ্বল দৃশ্য করতে হবে। আপনার বাস্তুহারা মেয়ে আর হিন্দুস্থানী ছেলে ভুলুয়া দোলনায় উঠে দুলবে। 'সিনসিনাকি বুবালাবু' কিম্বা 'মিল গিয়া মিল গিয়া' এই জাতীয় একটা হালকা গান এক্ষুনি রচনা করে দিন তো! সঙ্গীত পরিচালক আপনার জন্যে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছেন। এক্ষুনি রেকর্ডিং হয়ে যাবে— Quick—Please.

পরিচালক প্রভঞ্জনের মূল্যবান উপদেশাবলী শ্রবণ করে গল্প-লেখক গঙ্গাধর গায়েনের মনে হল—তুমি নেই, আমি নেই, কর্তা নেই, কর্ম নেই—সারা পৃথিবীটা একটা পয়সার মত ফুটো কিম্বা ধোঁয়ার মত আবছা!

হায়! কি কুক্ষণেই তিনি বাস্তুহারা মেয়েকে সৃষ্টি করেছিলেন! বাংলার সঙ্গে হিন্দি মিশ্রণ করে তাকে প্রেমের গান রচনা করতে হবে! কিসের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কে জানে!

পৃথিবীর মত তার গোটা মাথাটা ঘুরতে লাগল! তাই তো! সেট ঘুরছে—আকাশের চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র ঘুরছে, পরিচালক ঘুরছে, নায়ক-নায়িকা ঘুরছে···

গল্প-লেখক গঙ্গাধর গায়েন নিজের গল্পেরই তাল সামলাতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ছুটে এলো প্রযোজক, পরিচালক, ডাক্তার, বৈদ্যি, রিপোর্টার আর ভক্ত পাঠক-পাঠিকার দল। পরদিন কলকাতার নামজাদা দৈনিক কাগজগুলিতে মোটা হরফে খবর ছাপা হল :—

গল্প-লেখক গঙ্গাধর গায়েন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "বাস্তুহারা মেয়ে" রচনা করে অতি উত্তেজনায় হার্টফেল করেছেন! সৃষ্টি যখন স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যায় তখন এমনি অসম্ভব ঘটনাই ঘটে থাকে। গায়েন মশায়ের এই গল্প চিত্ররূপ লাভ করছিল, তারই চরম সার্থকতা উপলব্ধি করে গঙ্গাধর গায়েন মশাই আত্মহারা হয়ে আত্ম-বিসর্জন করেছেন। এই মহান আত্মোৎসর্গ বঙ্গ সাহিত্যে অভিনব। দেশের মনীষীবৃন্দ একে Swan Death Dance-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ধন্য গঙ্গাধর গায়েন! ধন্য তার গল্প লেখা!

শর্টকাট ও কাঁচকলা

রম্ভালালবাবুর ধারণা তাঁর আশেপাশে যে সব মানুষ বিচরণ করে তাদের শ্রম লাঘব করবার জন্যেই তিনি শ্রীদেহ ধারণ করেছেন।

বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় কি ভাবে কম খেটে বেশী রোজগার করা যায়, এই গবেষণা করতে করতে তিনি মাথার চুল পাকিয়ে ফেললেন—কিন্তু উপার্জন করা আর তার জীবনে ঘটে উঠল না! ভাগ্যিস বাপ মোটা রকম কোম্পানীর কাগজ রেখে গিয়েছিলেন, তাই দৈনন্দিন জীবন যাত্রার স্রোতে এখনও ভাটা পড়ে নি। নইলে কবে শুক্‌নো ডাঙায় নৌকো একেবারে আট্‌কে থাকত।

রম্ভালালবাবুর উর্বর মস্তিষ্ক বহু অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কম পরিশ্রমের কলা-কৌশল আবিষ্কার করতে গিয়েই সব মেহনত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে—লাঙ্গল চালানো আর শুরু করা সম্ভবপর হয় নি!

এ হেন রম্ভালালবাবুর সব গবেষণাই অভিনব এবং সব ব্যবস্থাই মৌলিকতার দাবী রাখে। অতি ছোট-খাট জিনিসের ভেতর দিয়েও তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা চালু করবার পক্ষপাতী।

শাক-সব্জীর ঝুড়ি নিয়ে চাষারা বাজারে যাচ্ছে—তিনি তাদের রাস্তার মাঝ-খানে থামাবেন এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে, কি ভাবে সমতা বজায় রেখে মাল বহন করলে পিঠের শিরদাড়া সোজা থাকবে আর মোট বইলেও মাথার কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু মুস্কিল এই যে, মেহনত করে যারা খায়—তারা রম্ভাবাবুর এই বিনামূল্যে বিতরিত সদুপদেশ গ্রহণ করতে চায় না, আবার বেশী পীড়াপীড়ি করলে গালমন্দ দিয়ে পাশ কাটিয়ে প্রস্থান করে।

মজুরেরা হয়তো মাটি কেটে রাস্তা ভরাট করছে; তিনি খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কর্মপন্থা নিরীক্ষণ করলেন, তারপর সবাইকে ডেকে বোঝাতে

চেষ্টা করলেন, কি angle-এ কোদাল ধরে মাটি কাটলে মেহনত কম হয় অথচ বেশী মাটি কাটা যায়। বাবুর কথা শুনে মজুরের দল হো-হো করে হাসতে থাকে। বলে পাগলা বাবু!

কিন্তু অত সহজেই রন্তালালবাবু হাল ছেড়ে দেন না। পরের উপকার করার মধ্যে যে কৃচ্ছ্রসাধন আছে তিনি তা আবিষ্কার করেছেন। জগতে তিনি তার বীজ ছড়িয়ে দিতে চান। বাইবেলের গল্প তাঁর মনে পড়ে যায়। কৃষক যখন ক্ষেতে বীজ ছড়ায় তখন কিছু পড়ে কাঁটাগাছের মধ্যে, কিছু পড়ে শক্ত অনাবাদী জমিতে, কিছু পড়ে পাথরের ওপর—এগুলি হয়তো পাখীতে খেয়ে যায়। কিন্তু ভালো এবং চযা জমিতে যে বীজগুলি পড়ে তা থেকেই জন্মায় আসল ফসল। মানুষের মনও তাই। রন্তাবাবু জানেন, সবাই হয়তো তার সতুপদেশ গ্রহণ করবে না। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যারা তার কথা শুনবে এবং মনে প্রাণে সেই পথে কাজ করবে, তারা উপকার পাবেই। এ বিষয়ে রন্তালালবাবু একেবারে স্থিরনিশ্চয়।

একদিন রন্তাবাবু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন হঠাৎ তার দৃষ্টি গেল, গোয়ালারা রাস্তার গঙ্গাজলের কল থেকে বেমালুম দুধের সঙ্গে জল মেশাচ্ছে।

দেখেই রন্তাবাবুর সমস্ত রক্ত ব্রহ্মতালুতে গিয়ে উঠল। এমনিতে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ তিনি। কিন্তু এই জাতীয় অনাচার দেখে চুপচাপ বসে থাকা যায় কখনো? এই দুধের ভেতর দিয়েই ওরা সারা দেশের লোকের মধ্যে রোগের বীজাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে! কি কুশিক্ষা! তিনি গোয়ালাদের ডেকে জড় করলেন। তারপর তাদের উদ্দেশ করে বললেন, দেখ ভাইরা, দুধে তোমরা জল মেশাবে সে কথা জানি। ইংরেজী অক্ষর Q যেমন পাশে U কে না নিয়ে পথ চলতে পারে না তেমনি জল না মিশিয়ে তোমরা দুধ বিক্রী করতে পার না—একথা আমি জানি। তাই বলে নোংরা জলগুলি দুধের সঙ্গে মেশাবে? সোজা আমার বাড়ির উঠোনে চলে যাবে—ফিটকিরি দিয়ে জল পরিষ্কার করে জালা ভর্তি রেখে দেব, যত খুশী মিশিয়ে বিক্রী কর—আমার কোন আপত্তি নেই।

গোয়ালারা প্রথমে রন্তাবাবুর ডাকে হকচকিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল বাবু বোধকরি কর্পোরেশনের লোক হবেন। একটা ফ্যাসাদে ফেলতে কতক্ষণ! কিন্তু

যখন জানা গেল যে, তিনি গায়ে পড়ে মোড়লি করছেন, তখুনি গোপবৃন্দের স্বরূপ প্রকটিত হয়ে উঠল। উপদেশের পরিবর্তে তারা বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় গাল দিতে দিতে দল বেঁধে প্রস্থান করল।

রম্ভাবাবু আপন মনে ক্ষেদোক্তি করে বলেন,

"উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"

রম্ভাবাবুর "কপালকুণ্ডলা" পড়া ছিল! সংসারে একদল লোক থাকে যারা পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করবেই। আমাদের রম্ভাবাবু এইরকম পরের জন্যে কাষ্ঠ আহরণ করে থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কি কুক্ষণে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই কথাই শুধু ভাবছি। যে কাহিনীটি গৃহের গৃহিণীর কাছে গোপন রেখেছি—আজ নিরিবিলি তাই আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। শুনতে পাই হৃদয়ের গোপন কথার ভার লাঘব করলে মানুষের মন আপনা থেকেই হালকা হয়, সে তখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারে। আমিও তাই একটু আরাম করে বুকের ঝোঝা হালকা করে ঘুমুতে চাই।

যাক্ এবার আসল ঘটনায় আসা থাক্। এক আত্মীয় বাড়ীতে বৌভাতের নেমন্তন্ন ছিল। তাই পুলাকত হয়ে ওঠবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। এই রেশনের যুগে অতিথি নিয়ন্ত্রণের আমলে কে কাকে নেমন্তন্ন করছে!

শুধু নেমন্তন্নে গেলেই তো হল না, তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও তো করতে হবে! সেই জন্যে সকাল থেকে যথেষ্ট ঝামেলা যাচ্ছিল দেহ ও মনের ওপর দিয়ে।

প্রথম কথা, বিয়ে বাঁড়ি যাবার মত বাড়তি জামা কাপড় নেই! কণ্ট্রোলের দয়ায় একটি কাপড়ে এসে ঠেকেছে। তাই পরেই ডালহৌসী স্কোয়ারে কেরানীগিরি করতে যাই আর সকাল-সন্ধ্যেয় ছাত্র ঠ্যাঙাই। সুতরাং শেষ রাত্তিরে উঠেই সাবান দিয়ে জামা, ধুতি, গেঞ্জি সব কেচে দিলাম—যাতে অফিসে যাবার আগেই সব শুকিয়ে যায়। তারপর বিয়েতে প্রীতি উপহার দেবার একটা প্রথা আছে! মাসের শেষ—নগদ টাকা খরচ করে কিছু কিনে দেবার উপায় নেই। খাতা-পত্তর ঘেঁটে বের করা গেল একখানি বই। কবে কোন্ বন্ধুর কাছ থেকে পড়তে

এনেছিলাম—কিন্তু আর ফেরত দেয়া হয় নি। ভালই হয়েছে। যাকে রাখা যায় সেই রাখে।

বইখানির নানা পাতায় বন্ধুর নাম লেখা আছে। ধীরে ধীরে ব্লেড্ ঘষে সেগুলি তুলে ফেলতে হল। তারই ওপর 'নববধূর করকমলে' কথাটা বেশ কলাসম্মত ভাবে লিখে একটি কর্তব্য সমাধা করলাম।

ওদিকে ঘন ঘন খবর নিতে হল যে, জামাকাপড় শুকিয়েছে কি না। যথা-সময়ে সূর্যিঠাকুর কৃপা করলেন এবং স্নানাহার সমাপনান্তে গৃহিণীকে জরুরী ঘোষণা জানিয়ে দিলাম—নেমন্তন্ন আছে, রেশনের যুগে যেন রাত্তিরে আমার চাল নিয়ে অপচয় করা না হয়।

এক খিলি পান মুখে দিয়ে উপহারের বই বগলে নিয়ে তড়িৎবেগে বাসের উদ্দেশ্যে ধাবিত হলাম। এরপরে মূল কাহিনীর ছেদ পড়ল অফিসের দৈনন্দিন ফাইল ঘাঁটার কাজে এবং নতুন করে গল্পের যবনিকা উত্তোলিত হল সন্ধ্যেবেলা ছুটির পর।

অফিস থেকে বেরুতে আমার একটু রাতই হয়ে থাকে। যখন বেরুলাম বেশ নির্জন হয়ে গেছে রাস্তাঘাট। দিব্যি ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। ভাবলাম, ট্রামে-বাসে না উঠে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই, গায়ের ঘামটাও মরবে, সারাদিনের গুমোট ভাবটাও একটু কাটবে।

বৌবাজার স্ট্রীট ধরে চলতে শুরু করে দিলাম। আত্মীয়টির বাসা আমার জানা ছিল না। কিন্তু পকেটে নেমন্তন্ন চিঠিখানি ছিল। পথের লোককে জিজ্ঞেস করে গলিটি কি আর খুঁজে বের করা যাবে না?

চাবিকাটি যখন হাতে আছে তখন আর ভাবনাটা কি? একটা গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে আপন মনে এগিয়ে চললাম।

কলেজ স্ট্রীট আর বৌবাজারের মোড়ে এসে মনে হল চিঠিটা বের করে এক-বার ঠিকানাটা দেখে নেয়া ভালো। নইলে হারা-উদ্দেশ্যে আর কতদূর ঘুরব? তবে এইটুকু মনে ঠিক আছে যে সারপেণ্টাইন লেন, বৌবাজার আর শেয়ালদা অঞ্চলের কাছাকাছি কোথাও হবে।

রঙীন কারুকার্য করা চিঠিখানি পকেট থেকে বের করে একমনে ঠিকানা দেখছি, এমন সময় অতর্কিত নৈশ-আক্রমণের মত এসে হাজির হলেন রম্ভালালবাবু।

রম্ভাবাবুর চোখে-মুখে পরের উপকার করবার একটা সোনালী-সদিচ্ছা খেলে বেড়াচ্ছে। আমাকে হাতের কাছে পেয়ে তিনি যেন বর্তে গেলেন। বললেন, আরে বৃন্দাবন যে! বিয়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছ বুঝি? তা উপহার কি নিলে দেখি—

কুণ্ঠিত হয়ে জবাব দিলাম, কি আর এমন নিতে পারি? সামান্য একখানি বই নতুন বউকে উপহার দেব।

কিন্তু অত সহজে রম্ভাবাবু আমায় নিষ্কৃতি দিলেন না।. প্যাকেটটি হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেললেন; তারপর মুখ বিকৃত করে বললেন, উঁহু! শুধু একখানি বই কি নতুন বৌয়ের হাতে তুলে দেয়া চলে?

আমি জবাব দিলাম, উপায় কি বলুন, নেহাৎ ছাপোষা মানুষ—

রম্ভাবাবুর মুখে-চোখে ব্যস্ততা দেখা গেল।

বললেন, তা হলে নিদেন পক্ষে রজনীগন্ধার কয়েকটা ঝাড় নিয়ে যাও। একটি টাকা দাও চট করে আমার হাতে। বৌবাজারের মোড়ে খুব টাটকা রজনীগন্ধা পাওয়া যায়। আমি এক্ষুনি তোমায় কিনে দিচ্ছি—

ঘড়ির পকেটে সযত্নে ভাঁজ করা সর্বসাকুল্যে একটি মাত্র এক টাকার নোট সম্বল ছিল। রম্ভাবাবু যে রকম আগ্রহ করে বললেন, তাতে আর কোন মতেই আপত্তি উত্থাপন করা চলে না।

রম্ভাবাবু আমায় ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে, রজনীগন্ধা 'শ্রী'র প্রতীক, আর বই হচ্ছে জ্ঞানের প্রতীক···তাই এই দুটি বস্তু মিলিয়ে নববধূর হাতে দিলে উৎকৃষ্ট উপহার হবে।

এমন ব্যাখ্যার পরও আমি যদি আপত্তি উত্থাপন করতাম, কিম্বা বলতাম যে, আগামী কাল সকালে রুগ্না মেয়ের দুধ-বালির ব্যবস্থা করতে হবে, তবে রম্ভাবাবু আমার বেরসিক নাম চারদিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে দিতেন যে, সেটা মৃত্যুরই নামান্তর হত!

রজনীগন্ধার ঝাড় নিয়ে পাশ কাটাবো, এমন সময় রম্ভালালবাবু আবার আমার পথ আটকে দাঁড়ালেন।

বললেন, দেখি নেমন্তন্ন চিঠিটা—কোন্ পাড়ায় নেমন্তন্ন খেতে যাবে ?

অগত্যা কার্ডখানা আবার তার হাতে তুলে দিলাম। বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। নেমন্তন্ন চিঠি পড়ে তাঁর নতুন কোন পরোপকার-প্রবৃত্তি জেগে না ওঠে !

কিন্তু আমার অবস্থা যে ভাঁড়ে-মা-ভবানী সে কথা তো তিনি আর তলিয়ে বুঝতে চাইবেন না।

যেন পাশ-ফেলের খবর বলা হচ্ছে, এমনি ভাবে শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

তিনি চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, ও! সারপেন্টাইন লেন। আমিও যে সেই অঞ্চলেই যাচ্ছি। চলো, তোমায় সর্টকাটটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ভাগ্যিস্ আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল—নইলে এ জায়গাটা তুমি খুঁজেই বের করতে পারতে না।

যাক। ঘাম গিয়ে জ্বর ছাড়ল।

টাকা-পয়সা খরচের আর কোন মামলা নয়। শুধু সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেয়ার ব্যাপার।

এতে তো আমারই স্থবিধে হল।

নইলে বাঁশবনে ডোম-কানার মতো ঘুরে বেড়াতে হত আর কি! সারপেন্-টাইন লেন শুনেছি সাপের মতই আঁকা-বাঁকা!

আমায় ইতস্তত করতে দেখে রম্ভালালবাবু বললেন, আর তোমায় কিছু চিন্তা করতে হবে না। আমার দেখা যখন পেয়েছ—তখন একেবারে চোখ বুঁজে সোজা নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।

আত্মতৃপ্তির মৃদুহাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

রম্ভাবাবুর পেছনে-পেছনে এগিয়ে চললাম। আমার এক হাতে বই, আর এক হাতে রজনীগন্ধার ঝাড!

সব সময়ই ভয়—কার কনুয়ের গুঁতোয় বই পড়ে যায়, কিম্বা কার ধাক্কায় রজনীগন্ধা যায় গুড়িয়ে—

রম্ভাবাবু কিন্তু বড় রাস্তা ধরে বেশীক্ষণ এগুলেন না। হুট্ করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে নির্দেশ দিলেন—আমার পেছন পেছন চলে এসো—

তাঁর গম্ভীর গলা শুনে মনে হল, তিনি যেন কাপালিক আর আমি যেন নবকুমার। নিবিড় অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন তার হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া দায়।

যাই হোক্—পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

রম্ভালালবাবু বলতে বলতে আর বোঝাতে বোঝাতে চললেন,—তোমায় বলি বৃন্দাবন, এই কলকাতা শহরের সমস্ত অলি-গলি একেবারে আমার নখদর্পণে! এতে যে কাজের কত সুবিধে হয়, আর কত সময় বেঁচে যায় সে কথা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না! হারা উদ্দেশ্যে অনিশ্চিত ভাবে ঘুরে তুমি দু ঘণ্টায় যে জায়গায় গিয়ে হাজির হবে—আমি আধ ঘণ্টায় হেলা-ফেলা করে তোমায় সেখানে নিয়ে হাজির করব।

গাধাবোট যেমন স্টীমারের পেছন পেছন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে চলে—নাকে দড়ি দেয়া বলদের মত আমিও তেমনি অনুসরণ করলাম রম্ভালালবাবুকে—এ-গলি থেকে ও-গলি, ও-গলি থেকে সে-গলি!···

সত্যি, অবাক হয়ে যেতে হয় গলির নমুনা দেখে! কলকাতা শহরে গা-ঢাকা দিয়ে এত অদ্ভুত ধরণের গলিও থাকে! দুপাশ থেকে বাড়িগুলি পথচারীকে যেন স্যাণ্ডুইচের মত চেপ্টে দিচ্ছে। আবার পায়ের নীচে প্যাচপেচে কাদা। সর্টকাট্ করতে গিয়ে জুতোর যা দশা হল—সে কথা খুলে না বলাই ভালো। কাছার দিকটা কাদার ছিঁটেয় একেবারে নামাবলীর মত হয়ে বহু কলঙ্ক-কণ্টকিত হয়ে উঠল!

মৃদু আপত্তি করতে গিয়েছিলাম—কিন্তু রম্ভালালবাবু বললেন, ওই তো তোমাদের দোষ। কত কম হাঁট্‌তে হচ্ছে সেটা আগে বোঝ! কত সময় বাঁচিয়ে দিলাম সেটা হিসেব করে দেখবে না, শুধু ওজর আর আপত্তি। এই দোষেই তো ভারত গেল।

আমায় দোষেই যদি ভারত যায় তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে! কাজে কাজেই চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি!

জন-কণ্টকিত, ষাঁড় অধ্যুষিত, কর্দমলিপ্ত এবং মস্তকোপরি জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ গলির ভেতর দিয়ে রস্তালালবাবুকে অনুসরণ করে চললাম—যেমন ভাবে নাকি ব্রীড়াবণতা নববধূ সাত পাকের সময় নিঃশব্দে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

একবার ডাইনের গলি, পর মুহূর্তে বাঁয়ের গলি, তারপর সাম্‌নের বাই লেন, অতঃপর পাশের সরু গলি, এই ভাবে যে কতক্ষণ পথ চললাম—তার আর হিসেব নেই!

সর্টকাট কথাটা কে আবিষ্কার করেছিলেন? মনে-মনে তার চৌদ্দপুরুষকে নরক নামক স্থানে প্রেরণের সর্ববিধ ব্যবস্থা করে রাগের ঝাল মেটাতে লাগলাম —কিন্তু রস্তালালবাবুর একেবারে কচ্ছপের কামড়! তিনি কিছুতেই সর্টকাট-পন্থা পরিত্যাগ করবেন না এবং আমাকেও নিষ্কৃতি দেবেন না!

হঠাৎ একটা বাড়ির বৈঠকখানার দিকে দৃষ্টি গেল আমার। এ কি! দেয়াল ঘড়িতে ন'টা বাজে!

এতক্ষণ ধরে শান্ত-শিষ্ট বালকের মত রস্তালালবাবুর অনুসরণ করে কালের যাত্রা পথে এগিয়ে চলেছি—ঘামে পিঠটা জ্যাবজেবে হয়ে গেছে! ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি—, রজনীগন্ধার ওপরকার ফুলের অংশ নেই! শুধু ডাঁটাগুলি অবশিষ্ট রয়েছে! তা হলে ইতিমধ্যে ব্যাপার কি ঘটল?

মস্তিষ্ক পরিচালনা করে বুঝতে পারলাম, গলিগুলির ভেতর দিয়ে ক্রমাগত শিবের বাহনেরা যাতায়াত করছে। তারাই দয়া করে ফুলগুলি প্রসাদী করে দিয়ে গেছে। একটা টাকার জন্যে নিজের অজান্তেই দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। টাকাটা পকেটে থাকলে নিদেন পক্ষে কাল সকাল বেলাকার বাজার-পর্ব সমাধা হত।

কিন্তু সে তো আগামী কালের কথা। আজ নেমন্তন্ন বাড়িতে পৌছুতে পারব তো? মনে মনে আবৃত্তি করলাম—

আর কতদূরে নিয়ে যাবে তুমি রস্তালাল?
রাত্রে গৃহিণী ফিরিলে কেবলি পাড়িবে গাল!

সত্যি, বিশেষ সন্দিহান হয়ে উঠলাম।

রম্ভালালবাবুর যেন কেমন গোঁ চেপে গেছে। যে করেই হোক—যত দেরিই হোক্—সর্টকাট্ তিনি আবিষ্কার করবেনই।

আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, এই ধর না কেন, মানে ভগবান না করুন—হিন্দুস্থানের সঙ্গে যদি পাকিস্তানের লড়াই বাঁধে—তবে পূর্ব অঞ্চলের যুদ্ধে সেই দলই জিতবে—যার সর্টকাটগুলি ভালো করে জানা আছে। পূর্ব পাকিস্তানকে কত দিক দিয়ে সাঁড়াশী আক্রমণ করা চলে সেই কথা বোঝাতে বোঝাতে আমরা আরো অনেকগুলি গলি পরিক্রমা করে এলাম।

সর্বনাশ! ঘড়ির কাঁটা দশটার দিকে এগুতে চলেছে!

হঠাৎ সামনে সানাইয়ের পোঁ শুনে রম্ভালালবাবু সচকিত হয়ে উঠলেন। ত্রেতা যুগে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে গোপিনীরাও এমন আকুল হয়ে উঠতেন কিনা সন্দেহ।

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ব্যস! এইবার তোমার বিয়ে বাড়ি এসে গেছে। কত সর্টকাটে যে তোমায় নিয়ে এসেছি—সে কথা নিজেই বুঝতে পারছ।

আমাকে আর টুঁ শব্দটি করবার সুযোগ না দিয়ে রম্ভালালবাবু একেবারে হাওয়া হয়ে গেলেন!

সর্টকাটের জন্যে যে একটা ধন্যবাদ জানাব, সে সুযোগও আমার জুটল না।

যাই হোক্- এবার আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চাই। চলতে চলতে পায়ের দড়িগুলো যেন একেবারে আল্‌গা হয়ে গেছে। নিমন্ত্রণ যদি বা না জোটে বিশ্রাম তো খানিকটা পাব।

গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই একটি উৎসাহী ছোকরা গলায় একটি মালা পরিয়ে দিলে। ভেতরে ঢুকলাম। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে শুধোলেন, আজ্ঞে আপনি কোন্ বাসা থেকে আসছেন? মনে হল, ভদ্রলোক আমায় চিনতে পারছেন না বলেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন!

আমিও যেন খানিকটা অস্বোয়াস্তি বোধ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আজ্ঞে,

এটা কি ধনেশবাবুর বাড়ি নয় ?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এইবার মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে না। আমি ঠিক এই রকমই একটা সন্দেহ করছিলাম। আজকালকার দিনে অনেক ভদ্রলোকই একটা রজনীগন্ধার ঝাড় হাতে নিয়ে এই ভাবেই বিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে, তারপর দিব্যি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাধা করে—হাত মুছতে মুছতে প্রস্থান করতেও তাদের বিলম্ব হয় না! কিন্তু গোঁদল চক্কোত্তীর চোখকে ফাঁকি দেয়া সোজা নয়।

আপন রসিক তাতেই বুড়ো ভদ্রলোক ভাঙা দাঁতগুলি বের করে হাসতে লাগলেন।

হায় রজনীগন্ধার ঝাড়!

তখন রম্ভালালবাবুর মুণ্ডুপাত করতে বাসনা জাগছিল। একটা ধূমকেতুর মতো উদিত হয়ে পুচ্ছতাড়নে তিনি যে প্রলয়ের সৃষ্টি করে গেলেন—সেটা সামাল দেবার সাধ্যি আমার ছিল না!

গালে শক্ত হাতের একটি চড় খেয়েছি—মুখের ভাবটা এই রকম করে আস্তে আস্তে সানাই-বাজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

এতক্ষণ রম্ভালালবাবুর অভিভাবকত্বে অন্য কিছু ভাবতে পারি নি। এইবার স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে বুঝলাম, পেটের ভেতর ইঁদুর কোনি ডন্ ফেলছে।

আমার আত্মীয়-বাড়িটি এখান থেকে আবার কতদূর হবে কে জানে? ঠিকানাটা আর একবার ভালো করে দেখে নি।

পকেটে হাত দিয়ে হাঁ হয়ে গেলাম! নেমন্তন্নের চিঠিখানি তো রম্ভালালবাবুর হাতেই রয়ে গেছে!

স্মরণ শক্তির খ্যাতি আমার কোন কালেই ছিল না। অর্জুনের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে কর্ণ যেমন কিছুতেই তার অতি পরিচিত অস্ত্রগুলির নাম স্মরণ করতে পারে নি—আমিও ঠিক তেমনি সাবপেনটাইন লেনের এক অপরিচিত অংশে দাঁড়িয়ে আমার অতি প্রয়োজনীয় বাড়ির নম্বরটা কিছুতেই চিন্তা করে মনে আনতে পারলাম না।

পেটের জ্বালাটা যেন নতুন করে আমায় তাগিদ দিতে লাগল।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

একটা ডাষ্টবিনের ধারে কতকগুলি এঁটো কলাপাতা নিয়ে কুকুরদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে এটা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সমরের প্রতীক কিনা তা নিয়ে বন্ধুমহলে সরস আলোচনা চালানো যেত।

কিন্তু দেহ আর মন দুইই প্রতিকূলে।

একটা দিক ধরে এগিয়ে চললাম। ঠিক বোঝা গেল না কোন্ পথে চলেছি। দৃষ্টি রয়েছে আমার পথের দুদিকে।

কিন্তু একটি খাবারের দোকানও খোলা নেই! কত রাত হয়েছে কে জানে!

হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘর থেকে আলো বেরুচ্ছে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। চিড়ে, মুড়কি, মুড়ি—যা পাওয়া যায় চিবুতে রাজী আছি। কিন্তু না, এটা পানের দোকান।

দোকানী বললে, সোডা চাই? দেব ভেঙে? খালি পেটে সোডা খেলে কি অবস্থা হবে সেকথা অনুমান করে চোঁ-চোঁ দৌড় লাগালাম।

আরো খানিকটা পা চালিয়ে চলে গেলাম।

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি,—কালো মেঘ তারাগুলিকে ঢেকে ফেলেছে। গুরু গুরু আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। তারপর ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

নিজের জন্যে না হোক, বইখানাকে বাঁচাবার জন্যে একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঠিক তক্ষুনি ছুটতে ছুটতে একটা লোক এক ঝুড়ি কলা নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিলে।

ভাবলাম, ভালই হল। অন্তত কলা খেয়ে ক্ষিদেটা বাগে আনা যাবে।

পুষ্টু কলা…বেশ পাকা।

জিজ্ঞেস করলাম, ছ'গণ্ডা কলা কত নেবে?

লোকটা জবাব দিলে, আট গণ্ডা পয়সা দেবেন কর্তা—

দর কষাকষি করতে চাইনে।

মনটা এমনি খিঁচড়ে আছে। তার ওপর গরজ বড় বালাই!

কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে আবার রাঘব বোয়ালের মত হাঁ করে ফেললাম!

একটা টাকাই সম্বল ছিল,—ফুল কিনতে ফতুর হয়ে গেছি—

হায় পুষ্পহীন রজনীগন্ধার ঝাড়!

তুমি কবিদের কাব্যলোক ছেড়ে শেষ কালে আমার মত কেরানীর স্কন্ধে অধিষ্ঠিত হলে!

পক্ক কদলী আর কপালে জুটল না।

কাচকলা খেয়ে বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে খালি পেটে রাত বারোটায় যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম—তখন গৃহের গৃহিণী একেবারে তপ্ত হয়ে বসে আছেন!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার শূন্য উদরের কথা আর বলবার ভরসা হল না।

সর্টকাট আমার হার্টকেও হত্যা করেছে।

তাই বর্ষণ মুখরিত সেই রজনীতে রজনীগন্ধার পুষ্পহীন বৃন্তগুলি নিষ্পেষণ করে হৃদয়োচ্ছ্বাস রুদ্ধ করে রাখলাম।

প্রস্তাব

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বিনা নোটিশে বাপ মারা যাওয়ায় বটুক যেন আচম্‌কা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ! মাথার ওপর অভিভাবক কেউ নেই, এখন কোন্ পথে সে এগুবে সেইটেই হল দুশ্চিন্তা। যাদের বাপ হঠাৎ মারা যায় এবং গোটা সংসারের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়ে, তারা বোঝার ভারে আর সংসারের চাপে বেশ কাবু হয়ে পড়ে—সুতরাং বটুকের মত এমন এলোমেলো অবস্থায় পড়ে না। বটুকের জীবনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। মাথার ওপর কোন অভিভাবক নেই, বাপ নেহাৎ পথের ভিখিরী করে রেখে যান নি, ব্যাঙ্কে বেশ মোটা নগদ টাকা আর প্রচুর কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রেখে গেছেন, যাতে সংসার-সমুদ্রে ছেলেকে হাবুডুবু খেতে না হয় !

এ অবস্থায় বটুক সত্যি চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কোন্ পথে সে এগুবে !

এক বুড়ী দিদিমা শিবরাত্তিরের সলতের মত দেশের বাড়িতে ক্ষীণ আলো জ্বালিয়ে চলছেন। তিনি চিঠি লিখলেন: এইবার একটি টুকটুকে বউ এনে সংসারী হও। পাছে তিনি তাঁর নির্বাচিতা কোন মেয়ে সহ এসে আচম্‌কা এখানে উপস্থিত হন—সেই ভয়ে বটুক সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে, ওর শরীর খারাপ—পশ্চিমে হাওয়া খেতে যাচ্ছে !

কিন্তু কলকাতাতেই ফুটবল খেলে যখন প্রচুর খিদে পাচ্ছে—তখন খামোখা পশ্চিমের ধুলো খেতে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

বটুক তাই বিভিন্ন টিমের সঙ্গে ম্যাচ খেলে, রেষ্টুরেণ্টে চপ-কাটলেট গিলে আর হাল্‌কা হিন্দী ছবি দেখে দিনগুলি কাটিয়ে দিতে লাগল।

এক বন্ধু এসে সদুপদেশ দিলে, দেখ্ ভাই, তোর বাবা যখন ব্যাঙ্কে প্রচুর

টাকা রেখে গেছেন—তখন বাণিজ্যে সেটা বাড়িয়ে তোলা উচিত। জানিস্ তো, শাস্ত্র বাক্য বলছে—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী!"

বটুক মাথা নেড়ে জবাব দিলে, সে তো সত্যি কথাই! কিন্তু কি ব্যবসা করা যায় বল্ তো?

বন্ধু গোপীমোহন সোল্লাসে উত্তর দিলে, আজকের দিনে সে কথা আবার নতুন করে বলতে হবে নাকি? এ যুগে একটি মাত্র বাণিজ্যেই প্রচুর টাকা এবং তার নাম হচ্ছে--সিনেমা।

বটুক মুখ কাচুমাচু করে উত্তর দিলে, কিন্তু ভাই আমি যে সিনেমা বিজনেসের কিছুই জানি নে!

—তার জন্যে আটকাবে না। অভিজ্ঞতার প্রসন্ন হাসি হাসে গোপীমোহন।

গোপীমোহন বটুকের কাছে গিয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। ফিস্ ফিস্ করে বলে, রঞ্জিতা দেবীর নাম শুনেছিস তো? নামকরা ফিল্ম-ষ্টার। আমার সঙ্গে খুব পরিচয় আছে। তোকে একদিন নিয়ে যাব তার কাছে।

অপরিচিতা মহিলার কাছে যেতে বটুক খুবই সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু গোপীমোহন নাছোড়বান্দা!

একদিন বটুকের গাড়ি করেই দুজনে গিয়ে হাজির হল রঞ্জিতা দেবীর রিজেণ্ট পার্কের বাড়িতে।

রঞ্জিতা ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। নিজের অভিনয়ের বিভিন্ন পোজের ছবি দেখালেন, তাঁর কি কি ভালো লাগে জানালেন, বিভিন্ন কাগজে তাঁর অভিনয়ের ও রূপের কি রকম প্রশংসা করেছে সেই 'কাটিং'গুলি পড়ে শোনালেন, তারপর মৃদু হাস্যে বললেন, বটুকবাবু যদি খুশী মত সন্ধ্যের দিকে তার গৃহে পদধূলি দান করেন তবে ফোন করে এলেই ভালো হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফোন নম্বর সমেত ছাপানো কার্ড একখানিও ওর হাতে গুঁজে দিলেন।

ফিরতি মুখে গোপীমোহন শুধোয়, কেমন দেখলি রঞ্জিতাকে? এ ফুটবলের মাঠ নয় যে প্রতিপক্ষের জবাবে একটা লম্বা সট্ মেরে দেবে!

বটুক কোন উত্তরই দিতে পারে না! শুধু রঞ্জিতার কার্ডখানি তার বুকে

কেবলি খোঁচা দিতে থাকে।

এই ঘটনার দিন দুই পরের কথা।

একটা ম্যাচ জিতে বটুক নামকরা একটি রেষ্টুরেণ্টে খুব চপ-কাটলেট গিলছে—পাশের কামরার দু-একটি কথা শুনেই ওর কান সজাগ হয়ে উঠল।

গোপীমোহন না! হ্যাঁ, গোপীমোহনই আর একটি ভদ্রলোককে বলছে—দিয়েছি রঞ্জিতাকে সামনে এগিয়ে! এইবার বটুক ভায়ার মুখে আর কথাটি নেই! সাপ যেমন হরিণকে চোখের দৃষ্টিতে হিপ্‌নোটাইজ করে—ঠিক তেমনি ভাবে ওকে খেলিয়ে তুলবে রঞ্জিতা। প্রস্তাবটা রঞ্জিতার কাছ থেকেই আসবে কিনা! আর আমাদের কোন ভাবনা নেই। এখন শুধু বসে বসে পা নাচানোর পালা!

বলা বাহুল্য, বটুক আর এর পর কোন প্রস্তাব শুনতে ওদিকে পা বাড়ায় নি।

কিন্তু আর একটি প্রস্তাব এল…অন্য একটি অঞ্চল থেকে।

বটুকের দূর সম্পর্কের এক পিসেমশায়ের শালা একদিন এক পা ধুলো নিয়ে এসে উপস্থিত!

গ্রামের লোক—কোন ভনিতার ধার ধারেন না। বললেন, জামাইবাবুর মুখে আপনার কথা শুনেই ছুটে আসছি। আমার অনেক দিনের প্ল্যান—ট্র্যাকটর দিয়ে একেবারে বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় একটি কৃষি-প্রতিষ্ঠান করব। তা ভগবান যখন আপনাকে ঝুলি ঝেড়ে দিয়েছেন—মানে-টাকা অনেকেরই থাকে কিন্তু এই বয়সে তো কেউ হাতে পায় না—তাই বলছিলাম কি আমার পেছনে এসে একবারটি শুধু দাঁড়ান! আর আপনাকে কিছু দেখতে হবে না।

পেছনে দাঁড়িয়ে কোন কিছু নিরীক্ষণ করবার বাসনা বটুকের আদৌ নেই। কেননা সে চিরকাল মাঠে নেমে সরাসরি গোল দিতে ভালবাসে, আর তার স্থান সব সময়েই ফরোয়ার্ডে।

কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, একজন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলেই আর একজন এসে হাজির হয় এবং তার প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবের হাত থেকে বটুক কি করে রেহাই পাবে সেই হয়েছে ওর মস্ত বড় ভাবনা।

মনে মনে ভাবলে, দিন কতক গা ঢাকা দিলে মন্দ হয় না। দেশের দিদিমা

কখন যে এসে সশরীরে আবির্ভূতা হন সে কথা বলা শক্ত।

সেদিন সকাল বেলা এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে তার বৈঠকখানায় এসে হাজির।

—আমার একটি প্রস্তাব আছে আপনার কাছে।

—প্রস্তাব যখন—তখন তো শুনতেই হবে। আকাশ প্রমাণ উদাসীনতা নিয়ে বটুক জবাব দেয়।

—আজ্ঞে, আপনাকে সম্পাদক হতে হবে। এবারে বটুক সত্যি হকচকিয়ে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়, দেখুন, আপনি বেমালুম ভুল করেছেন। আমি লেখক নই, খেলোয়াড়। যদি কোথাও ম্যাচ খেলবার প্রস্তাব থাকে তো সোজাসুজি বলুন, নয় তো সরে পড়ুন।

—আজ্ঞে না, সরে পড়বার জন্যে তো আসি নি। ভালো করে আমার প্রস্তাবটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি—

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বটুক উত্তর দেয়, আচ্ছা তা হলে আপনার প্রস্তাবটা শেষ করুন—

—হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। ভদ্রলোক বেশ ঘনীভূত হয়ে বসেন। তারপর এক টিপ নস্যি নিয়ে শুরু করেন নিজের বক্তব্য :

—বুঝলেন, আমার একটি প্রেস আছে। আপনাকে আমি সরাসরি সম্পাদক করে দিচ্ছি। না, না, কোন ওজর-আপত্তি শুনব না আমি। সম্পাদক হিসাবে মলাটে আপনার নামটাই ছাপা থাকবে। আর যা করবার সব আমিই করব। আপনি টাইপের টাকা, কাগজের ব্যবস্থা, ব্লকের খরচা, সব জুগিয়ে যাবেন। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে কলকাতার বুকের ওপর একটি প্রথম শ্রেণীর কাগজের সম্পাদক হয়ে বসবেন। এ রকম প্রস্তাবে যে সম্মত হবেন—সে তো জানা কথাই। তা হলে আজই একটা লেখাপড়া হয়ে যাক।

ভদ্রলোক বিজয়গর্বে উল্লসিত হয়ে আর এক টিপ নস্যি নাসিকাদ্বয়ে গুঁজে আপন মনেই দুলতে লাগলেন। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও বটুকের পক্ষে বোঝানো শক্ত হল যে, রাতারাতি সম্পাদক হয়ে খ্যাতি অর্জন করবার বাসনা তার আদপেই

নেই। কিন্তু শুভানুধ্যায়ী যখন মরীয়া হয়ে ওঠে—তখন স্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং বটুকও সরাসরি সেই পন্থাই অবলম্বন করে প্রাণ বাঁচাল।

এইবার বটুকের পক্ষে বোঝা কিছুমাত্র শক্ত হল না যে, ভালো খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা তার পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। কেননা ইদানীং তাকে নিয়ে যে খেলা শুরু হয়েছে, তাতে গোল দেওয়া খুবই কঠিন কাজ।

মধুপুরে ওদের একটি বাড়ি আছে। বহুকাল থেকেই বাড়িটি খালি পড়ে আছে। একটি বুড়ো পুরোনো মালী দেখাশুনা করে।

যেমন মন স্থির হওয়া—অমনি বিছানা-পত্তর বেঁধে স্যুটকেশ গুছিয়ে সে তৈরী হয়ে নিল এবং সরাসরি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হল।

টিকিট কিনে একটি কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে সবে প্ল্যাটফর্মের দিকে রওনা হয়েছে এমন সময় সে যাত্রার মুখে পেছনে হাঁচি পড়ার মত একটি ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল।

—একটু শুনুন!

সর্বনাশ করেছে! এখানেও প্রস্তাব !!

বটুক মরীয়া হয়ে উঠল। এইবার একটা হেস্তনেস্ত সে করবেই!

—আপনাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। পেছন থেকে আর একটি মৃদু আলতো কথা ভেসে আসে।

চটে-মটে বটুক জবাব দিলে, তবে কি আপনার ধারণা আমি অভদ্র, জানোয়ার?

কিন্তু মুখটা ঘুরিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে হেস্তনেস্ত কোন রকমেই করা চলে না! কুড়ি-একুশ' বছরের শ্যামলী একটি মেয়ে। কিন্তু তার চোখ দুটি এত কালো আর চোখের পাতা এত ঘন যে মনে হল বুঝি বিশ্বের বিস্ময় তাতে জমা হয়ে আছে!

মেয়েটি এইবার আর একটু এগিয়ে এসে বললে, এত অভদ্র আর ইতর দেখেছি এই কয়েকটা দিনে যে ভরসা করে কাউকে আর কোন কথা বলতে পারিনে!—আপনি নিশ্চয়ই তাদের দলে নন।

এত বড় 'কমপ্লিমেণ্ট' বটুক জীবনে এত সহজ ভাবে পায় নি। তাই একেবারে হকচকিয়ে গেল। কাজেই যে 'প্রস্তাব'কে সে চিরকাল ভীতির চক্ষে দেখে এসেছে তাই বেমালুম ভুলে গিয়ে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলে, না-না, বলুন না, কি আপনার দরকার ?

মেয়েটির কাছ থেকে যা জানা গেল—তাকে অতি সংক্ষেপ ও সহজ ভাষায় বলা চলে—পূর্বাঞ্চল থেকে আসতে সে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে একরাত্রে হারিয়েছে। এখন কোন ভদ্র পরিবারে সে আশ্রয় চায়।

এর পর বটুক আর কোন্ মুখে না বলে !

—মধুপুর যেতে আপত্তি আছে আপনার ? নিজের অজান্তে সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে বসে।

—না-না, আপত্তি আবার কিসের ? ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে কতবার গেছি। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না। নাম আমার বাসন্তী।

অবলীলাক্রমে হেঁট হয়ে মেয়েটি বটুকের পায়ের ধুলো নিয়ে বসল।

এই এক হাট লোকের মাঝখানে এ কী কাণ্ড। বটুকের সত্যি লজ্জা করতে লাগল। জানাশোনা কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে ! তাই লজ্জাটাকে তাড়া-তাড়ি ঢাকবার জন্যে মেয়েটিকে নিয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসল। পকেটে টাকা থাকলে অন্য বিপদ এড়ানো অতি সোজা।

মধুপুরে এসে যেন বটুক আপন আনন্দেই পাখা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল। বাসন্তী যে কখন গিয়ে রান্নাঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছে—তাকে আর খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। কিন্তু বটুকের পুলক বাধা মানে না ! আপন উল্লাসেই সে আকুল ! একটি ফিতে, দুটো চুলের কাঁটা, কয়েকটি সেফটিপিন নিয়ে কারো সামনে কাজে-অকাজে দাঁড়ানোর মধ্যে যে এত আবেগ আর আনন্দ লুকিয়ে থাকতে পারে সে কথা কি বটুক এর আগে জানতে পেরেছিল ? ফুটবল মাঠে আধ ডজন গোল দিয়েও সে ইতিপূর্বে এত উল্লাস অনুভব করতে পারে নি।

সন্ধ্যেবেলা 'চয়নিকা' খুলে সে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে :

"আকুল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম—
কস্তুরী-মৃগ সম।"

ইদানীং লোকের প্রস্তাবকে সে ভীতির চক্ষে দেখে এসেছে। এখন কি জানি কি করে ওর নিজের মনে একটি 'প্রস্তাব' গুঞ্জন করে ফিরতে থাকে। কিন্তু নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয়। কি করে কখন কার কাছে সে প্রস্তাব পেশ করবে!

বটুক আপন মনে ঘামতে থাকে।

ইতিমধ্যে বাসন্তী ওকে দিয়ে অনেকগুলি বই আনিয়ে নিয়েছে। কখন যে ও পড়ে, কখন রান্না করে, কখন অঙ্ক কষে—সেটা বটুকের কাছে হেঁয়ালি মনে হয়।

মাঝে মাঝে ঝড়ের মত বাসন্তী ওর ঘরে এসে হাজির হয়। জিজ্ঞেস করে—এই ট্রানশ্লেসনটা করতে পারছি না। একটু দেখিয়ে দিন তো!

জানা বিষয়ও বুঝিয়ে দিতে ভুল করে বসে বটুক। বাসন্তী বলে, তবেই আমার অনুবাদ-করা শেখা হয়েছে! এই বলে খাতাখানি টেনে নিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে সরোবরের রাজহংসীর মত ওর মনে একটা দীর্ঘ জলের দাগ কেটে বারন্দায় দীর্ঘ ছায়া ফেলে আপন নিরালা কোণে চলে যায়। হয় তো সারাদিনে আর বাসন্তীর সন্ধানই মেলে না!

বটুক কোনদিন ফুল আনে, কোনদিন সুগন্ধী তেল কেনে, কোনদিন বা দোকান থেকে নতুন ডিজাইনের শাড়ী নিয়ে অগ্রসর হতে যায়…কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে না!

বাসন্তী কখনও কাপড় কাচছে, কখনও ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, কখনও ডালের বড়ি দিচ্ছে—কখনও বা বটুকের পুরনো বইগুলি গুছিয়ে রাখছে! গাছ-কোমর করে আঁচল জড়ানো, হাতে ঝাঁটা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম,…এমন সময় কি লাল টকটকে গোলাপ নিয়ে কাছে দাঁড়ানো যায়? বাসন্তী যদি খিলখিল করে হেসে ওঠে?

বটুক বারে বারে এগোয়—কিন্তু বারে বারেই ভগ্ন-মনোরথ হয়ে ফিরে আসে!

এ কী মেয়ে বাসন্তী।

সর্ব রকমে ওর পরিচর্যা করাই যেন তার কাজ। ওকে দিয়ে কি তার কোন প্রয়োজন নেই? ভদ্রতার খাতিরেও তো দু দণ্ড কাছে এসে দাঁড়াতে পারে, জিজ্ঞেস করতে পারে, কি সে খেতে ভালবাসে? কিন্তু রান্না যা আসে—চেষ্টা করেও তাতে খুঁত ধরে ঝগড়া করা চলে না!

বটুক এই জাতীয় সমস্যার কখনও সম্মুখীন হয় নি।

একদিন বাসন্তী ইন্দারার পাশে বসে একরাশ কাপড় সাবান দিয়ে কাচছে। বটুক বললে, তোমায় কি বাড়ির ঝি রাখা হয়েছে? কি তোমার দরকার আমাকে বললেই তো পার।

বাসন্তী মিটিমিটি হাসে আর কাপড় কাচে! কোন কথার জবাব দেয় না। এমন মানুষের সঙ্গে গলা চুলকে ঝগড়া করাও তো চলে না। রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বটুক ওখান থেকে সরে আসে।

কলকাতায় রাশি রাশি প্রস্তাব বটুককে একরকম তাড়া করেছিল। কিন্তু আজ মধুপুরের মধু বাসন্তী সন্ধ্যায় যখন ওর মনে একটি প্রস্তাব ভ্রমরের গুঞ্জনের মত গুণগুণ করে ফিরতে লাগল, তখন সে অনাথ বালকের মত নিজের বাড়ির আনাচে-কানাচেই ঘুরে বেড়াতে থাকে।

সেদিন একটি জুয়েলারী দোকানে সুন্দর একটি মুক্তার-আংটি দেখে বটুকের পছন্দ হয়ে গেল। পাঁজিতে কি লগ্ন ছাপা আছে ওর জানা নেই। তবু তাড়াতাড়ি সে আংটি কিনে বাড়ির দিকে ছুটল। অদ্ভুত যোগাযোগ!

দোর-গোড়ায় একেবারে বাসন্তীর সঙ্গে মুখোমুখি। সে যেন ওরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যি তাই!

বাসন্তী এগিয়ে এসে লজ্জা-রাঙা মুখে বললে, আপনি আমায় কতদিন কত কিছু চাইতে বলেছেন। আজ একটি জিনিস আমি চাইব। দেবেন তো আমাকে?

এর উত্তর বটুক কি দেবে? আকাশ ফাটিয়ে উত্তর দিতে পারত। কিন্তু কিছুই সে করল না। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে কেবল-ই ঘামতে লাগল।

বাসন্তীর মুখে একরাশ লজ্জা। তবে কি বটুকের শুভ-লগ্ন সমুপস্থিত? তবু সে নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাসন্তী বললে, এক্ষুণি আমায় একটি সোনা-বাঁধানো লোহা এনে দিতে হবে। দেশ থেকে আসবার সময় গুণ্ডারা সব গয়না ছিনিয়ে নিয়েছে।

বটুক অবাক হয়ে শুধোয়, কিন্তু সোনা-বাঁধানো লোহা কেন? কি গয়না তোমার চাই বল—সব এনে দিচ্ছি।

বাসন্তীর মুখে ম্লান হাসি!

সে ধীর কণ্ঠে জবাব দিলে, ওই সোনা-বাঁধানো লোহাই শুধু চাই। আমার স্বামীর খোঁজ পেয়েছি। তিনি আজই আসছেন! বিয়ের রাতে ঐটি তিনি আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

বটুকের কি কিছু জবাব দেবার ছিল? জীবনে শুধু একটি প্রস্তাবই তার মনে জেগেছিল। হাতে ছিল তার একটি লুকোনো আংটি। কিন্তু সে প্রস্তাব বটুক পেশ করতে পারল না কারো কাছে! তাড়াতাড়ি দোকানের উদ্দেশে ছুটল·· একটি সোনা-বাঁধানো লোহা কেনবার জন্যে। দুত্তোর, তোর প্রস্তাবের নিকুচি করেছে!

নারীর মন—সে বাইয়ে সোনা, আর ভেতরে প্রাণহীন শীতল লোহা! আপন মনে আওড়ায় সে। না,—বটুক তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে। ভদ্রলোক যদি এক্ষুনি এসে হাজির হন? ভারী লজ্জা পাবে বটুক। তাঁর আসবার আগেই সোনা-বাঁধানো লোহাটি বাসন্তীর হাতে পরিয়ে দিতে হবে।

কোন মেয়ের কাছে প্রস্তাব?—রক্ষে করো!

বানর নাচের খেলা

টিফিনের ঘণ্টায় আশা বিদ্যুৎকে একান্তে স্কুল কম্পাউণ্ডের একটি গাছ তলায় ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাল যে তোকে দেখতে এসেছিলো—হবু বর কি জিজ্ঞেস করলো ?

বাঁ চোখটা নাচিয়ে চোখে-মুখে ক্ষণপ্রভার চমক এনে বিদ্যুৎ উত্তর দিল, সে ভারী মজার ব্যাপার।

আশা আরও কৌতূহল বোধ করল। ঘনিষ্ঠ হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, আমার কাছে তুই লুকোবি ? বল না ভাই বর তোকে কি বললে ?

বেণী নাচিয়ে বিদ্যুৎ বলল, বর-বর করবিনে বলছি। দেখতে এলেই বুঝি বর হয়ে যায় ? অমন কত আসবে যাবে।

তারপর ভ্রূ কুঁচকে আপন মনেই যেন বলল, বিদ্যুৎকে বউ পাওয়া কি অতই সোজা ? সেজন্যে সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে না ?

অবশ্য বিদ্যুৎ এ গুমোর করতে পারে। বড়লোকের মেয়ে, গ্যারেজে সারে সারে গাড়ি, সুন্দরী বলে খ্যাতি আছে অভিজাত মহলে। ইস্কুলে অতি ছোটবেলা থেকে ওর ওপর ভার পড়ে সভাপতি, রাজ্যপাল কিম্বা প্রধান অতিথি পুলিস কমি-শনারকে মাল্যভূষিত করবার। ওর গাড়ি যখন ইস্কুলের কম্পাউণ্ডে এসে ঢোকে মেয়ের দল কেউ কেউ অবাক হয়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর এক দল তার চম্‌কে দেওয়া রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা ব্যাপারে বিদ্যুৎকে প্রশংসা করতে হবে। সে সবাইকার সঙ্গে হুল্লোড় করে মেশে আর গল্প জমায়। এ বিষয়ে তার কোন গুমোর নেই।

এরই মধ্যে আশা আবার বিদ্যুতের মনের-সই, যা কারো কাছে বলা চলে না আশার কানে কানে সেই কথা সে শুনিয়ে যায়। এই জন্যে আশার গর্ব আর গৌরব বড় কম নয়। ইস্কুল সুদ্ধু মেয়েরা ওকে হিংসা করে। বিদ্যুৎকে কে যে

দেখতে আসবে এ কথা সেই আগের দিন আশাকে গোপনে জানিয়ে গিয়েছিলো। সেই জন্যে আশা যেন সব কিছু জানবার আগ্রহে একেবারে ফেটে পড়ছে। তাই সে আবার শুধালো, বল না ভাই, কি বললে হবু বর?

বিদ্যুৎ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কেননা সেও তো বলবার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছে।

এইবার আশার হাত ধরে সে বললে, চল না ভাই, এই গাছের শেকড়টার ওপর নিরিবিলি দুজনে বসি।

দুইজনে পাশাপাশি বসল। ঝির-ঝির করে হাওয়া বইছিল। দুই সখির চুল দুলছে সেই হাওয়ার দোলায়। আশা জিজ্ঞেস করল, আগে বল দেখতে কেমন?

বিদ্যুৎ উত্তর দিল, ঠিক যেন মুখপোড়া বানর।

তারপর সে কি খিলখিলে হাসি। যেন কতকগুলো কাচের বাসন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে গেল।

বিদ্যুৎ মুখে আঁচল দিল, তবু তার হাসি থামে না। ওদিকে আশার পেট ফুলে জয়ঢাক। কতক্ষণে সব কথা জানতে পারবে।

বিদ্যুৎ বললে, বুঝতে পারলি নে? বিলাত-ফেরত কিনা, একেবারে বীর হনুমান। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, পিয়ানোর সঙ্গে নাচতে পারবে?

—তুই কি জবাব দিলি? আশা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—আমি? বিদ্যুতের চোখে মুখে হাসি উপচে পড়ে।

— আমি বললাম, আপনি সংস্কৃত শ্লোক মুখস্ত বলতে পারেন? তার জবাবে আমায় শোনাল, না আমি ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করতে পারি। আমিই বা ছেড়ে কথা কইব কেন? উত্তর দিলাম, আগে সংস্কৃতটা ভাল করে জেনে আসুন।

আশা শুধালো, তাহলে বর ফিরে গেল?

বিদ্যুৎ উত্তর দিল, হ্যাঁ একেবারে লেজ গুটিয়ে প্রস্থান।

আশা বলল, কিন্তু তোকে বিয়ে তো করতেই হবে বিদ্যুৎ—

বিদ্যুৎ এবার সইয়ের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল, আসল কথা কি জানিস? আমার নিত্যি নতুন নমুনা দেখতে ইচ্ছা করে। বানর নাচ দেখতে কার না ভাল

লাগে বল ?

আশা নিজের গালে তর্জনী রেখে চোখ দুটো বড় বড় করে উত্তর দিল, কি, সর্বনাশ ! তুই এইভাবে ছেলেদের বানর নাচ নাচিয়ে বেড়াবি নাকি ?

বিদ্যুৎ বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, মন্দ কি ?

এই ভাবে দিন গড়িয়ে যায়। দুই সখির মধ্যে কি কানাকানি চলে কেউ জানে না।

কিন্তু বিদ্যুতের মা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

বিদ্যুৎ বাবার ভয়ানক আদুরে মেয়ে। তাঁর মোটেই ইচ্ছে নয় যে মেয়ের এখন বিয়ে দেন।

শুধু গৃহিণীর তাগাদাতেই তিনি মেয়ে দেখাতে রাজী হয়েছেন।

হঠাৎ খবর এলো, এক ব্যবসায়ী পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

লাখ লাখ টাকা নিয়ে তার কারবার। মাথার ওপরে কেউ নেই, ছেলেই সমস্ত সম্পত্তি দেখে। সব ঠিকঠাক। ছেলে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একদিন মেয়ে দেখতে আসবে।

কিন্তু বাজার দরের ওঠা-পড়ার মতো ব্যবসায়ী-বরের কথার ঠিক থাকে না। শুভ পাঁজি দেখে দিন ক্ষণ ঠিক হয় কিন্তু মাল কেনা আর মাল ছাড়ার হ্যাঙ্গামে সে শুভ মুহূর্ত গত হয়ে যায়। তারপর ফোন আসে—সেদিন নয়, অন্যদিন ছেলে আসবে মেয়ে দেখতে।

বিদ্যুৎদের বাড়িতে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ চলে। "অ্যাপয়েন্ট্‌মেণ্ট" এখানে নড়চড় করা চলে না। তাই বিদ্যুৎ মাকে শুনিয়ে দেয়, যার কথার ঠিক নেই তার সঙ্গে আবার বিয়ে কী ? বাবাকে বলো ফোনে বারণ করে দিতে।

কিন্তু মা আশা পোষণ করেন মনে মনে। ভাবী জামাই এত টাকার মালিক, তাকে কি হুট্‌ করে হাতছাড়া করতে আছে ?

অবশেষে বিদ্যুৎ এসে আশার কানে কানে একদিন বলল, কাল রবিবার তো ? সকাল সকাল যাস আমাদের ওখানে।

আশা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। শুধোয়, বনভোজন করতে যাবি ?

—উহুঁ!

—বাসায় কোন পার্টি আছে বুঝি?

—উহুঁ!

—তবে বুঝি সিনেমা দেখতে যাবি ম্যাটিনী শোতে?

—না রে না।

—কি ব্যাপার বল না খুলে।

—বানর নাচের নতুন খেল!

হাসতে হাসতে জবাব দেয় বিদ্যুৎ।

আশা হাততালি দিয়ে উঠে বলে, ও! তাই বল? নিশ্চয়ই তোর নতুন বাঁদর দেখতে যাব। আর শুধু যাব? যতক্ষণ তার পোড়ামুখ না দেখছি—ততক্ষণ আমার চোখে ঘুম নেই।

বিদ্যুৎ তার বেণী টেনে জবাব দেয়, সত্যিই তো! বানর নাচের খেল দেখা ভাগ্যের কথা। আর তা ছাড়া আগে থেকে বেশ কয়েকটি নমুনা দেখে রাখলে তোর নিজেরটি চিনে নিতে বিন্দুমাত্র ভুল হবে না।

আশা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলল, মরণ আর কি।

পরদিন খুব সকাল সকাল সে গিয়ে হাজির হল।

বিদ্যুতের মাকে বলল,—মাসীমা, সইকে কিন্তু আমি মনোমত করে সাজিয়ে দেব।

বিদ্যুতের মা এক গাল হেসে উত্তর করলেন, সে তো সুখের কথা মা! তুমি তো ওর মনের কথা জানো, বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে দিও। যারা দেখতে আসবে চোখ ফেরাতে যেন না পারে।

আশা কৌতুক করে বলল, তা মাসীমা, বিনা সাজাতেই আমার সই সবাই-কার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, আপনি কিছু ভাববেন না।

যথাসময়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কয়েকখানি গাড়ি বোঝাই করে ব্যবসায়ী বর এসে হাজির হল।

বিদ্যুৎ তেতালার জানালা থেকে সেই বাহিনীর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে

নিয়ে সইকে বলল, ব্যবসায়ী হলেই বুঝি বোকা বুদ্ধি হয়? যেন নেকামর্দনের মেলায় গরু-ভেড়া যাচাই করে কিনতে এসেছে। আজ যদি আমি ওদের ঘোল না খাওয়াই তো আমার নাম তুই পালটে রাখিস।

যে হলঘরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ছেলে বসেছে—তার ত্রিসীমানায় বিদ্যুতের মা-বাবা কেউ যাবেন না।

বিদ্যুতের ধনুকভাঙ্গা পণ, মেয়ে দেখার সময় বাড়ির কেউ সেখানে থাকবে না। ওকে সবাই ভয় করে চলে তাই সে যে আবদার করে—তাতেই হুঁ দিতে হয়।

ইতিমধ্যে বাড়ির ঝি চাকরের দল নানারকম খাবার আর ফলের প্লেটে টেবিলগুলো ভর্তি করে ফেলেছে।

আশা বিদ্যুৎকে দোর গোড়া পর্যন্ত পৌছে দিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল কান খাড়া করে।

বসতে বলবার অপেক্ষা নেই বিদ্যুতের। গট্ গট্ করে গিয়ে একটা চেয়ার দখল করে বসল।

এরা যারা দল বেঁধে আজ এসেছে—শুধু হাজার হাজার টাকার লেন-দেন করতেই অভ্যস্ত, দর কষাকষি করতেও অপটু নয়। কিন্তু এই জাতীয় একটি অতি আধুনিকা তরুণী যদি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে সামনা সামনি এসে যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে চেয়ার দখল করে বসে পড়ে, তবে সেই পরিস্থিতিতে কি করা কর্তব্য ব্যবসায়ী মহলে তার তালিম দেয়া হয় না!

দ্রুত ফ্যান চলা সত্ত্বেও বর সহ বন্ধু-বর্গ কুল-কুল করে ঘামতে লাগল। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি একেবারে সপ্‌সপে হয়ে উঠল। একখানি করে রুমাল আর কতদিক সামলাবে!

বিদ্যুৎ ওদের এই পরাজিতের মনোভাব সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল···এইবার অতর্কিতে একটি বোমা ফেলার মতো প্রশ্ন করে বসল, আপনাদের কি সব জিজ্ঞেস করবার আছে আগে শেষ করে ফেলুন, তারপর ঠাণ্ডা সরবৎ-এ চুমুক দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করুন।

ব্যবসায়ী মহলে অনেক কিছু 'ভাওঁ' চলে, কিন্তু এই জাতীয় আক্রমণ ওদের

অভিধানে লেখা নেই। স্বয়ং হবু বর তো মেঝের দিকে চোখ রেখে ক্রমাগত কপালের ও ঘাড়ের ঘাম নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠল।

হঠাৎ বরের এক বন্ধু মরীয়া হয়ে বলল, না-না, প্রশ্ন আর কি? আপনি আমাদের সামনে দিয়ে একটু হাঁটুন না—

প্রশ্ন শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বিদ্যুৎ বলল, কেন, আপনারা কি গরু-ঘোড়া—মেষ-ছাগল হাঁটিয়ে যাচাই করে দেখতে এসেছেন? তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ হাটে আপনাদের বিকিকিনি চলবে না।

—হেঁ হেঁ সেই ভালো। তা হলে আমরা না হয় উঠি—! একান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ব্যবসায়ী মহল।

ভেড়ার পালের মত সবাই এক সঙ্গে উঠে পড়ল। এত তাড়াতাড়ি ওরা জুতোয় পা গলাতে গেল যে, একের পাদুকা অন্যের পদ যুগলের শোভা বর্ধন করেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে—গল গল করে ঝরছে ঘাম। বরের মনে হতে লাগল—ব্যবসা করতে এসে জীবনে এত বড় লোকসান সে দেয় নি!

হুড়মুড় করে সবাইকার নাটকীয় প্রস্থানের পর বিদ্যুতের সে কি প্রাণ খোলা হাসি। ওর রকম-সকম দেখে মনে হল—এইমাত্র একটি হাসির নাটক অভিনীত হয়ে গেল। কিন্তু তার নায়িকা যে সে নিজে, বিদ্যুৎকে দেখে তা বোঝবার যো নেই।

আশা কিন্তু একেবারে নির্বাক 'স্ট্যাচু' বনে গেছে। সে লজ্জায় আর বিস্ময়ে সইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

বিদ্যুৎ ওকে ঠেলে প্রশ্ন করলে, হ্যারে আশা, বল না সত্যি করে, বানর নাচ কেমন দেখলি?

আশা ভাবছিল—বিদ্যুতের মা যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন সে কি বলবে তাঁকে?

তাই সইয়ের রসিকতায় চটে উঠে বলল, থাক তুই তোর বানর নাচ নিয়ে, আমি চল্লুম—

বিদ্যুৎ পেছন ডেকে বলল, সই, তুই মিছিমিছি চট্‌ছিস কেন? না হয় একটু মিষ্টিমুখ করে যা—

কিন্তু আশা মর্মান্তিক চটে গিয়ে সত্যি সত্যিই চলে এলো।

এরপর বিদ্যুতের যে সম্বন্ধ এলো—সে নবীন তরুণ হচ্ছে বিধান সভার নতুন সদস্য। সাফল্যের উচ্ছ্বাসে তরুণ সর্বদাই উৎফুল্ল, আজ অভিনন্দন সভা, কাল পার্টি. পরশু প্রধান অতিথিরূপে সাদর আহ্বান।

এই অষ্টপ্রহর নাম সঙ্কীর্তনের মধ্যে একদিন কনে দেখবার দিন ধার্য হল।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চিঠি এলো আশার কাছে—বানর নাচের নতুন খেল—দেখবি আয়—বিলম্বে হতাশ হবি—আগেই জানিয়ে রাখছি।

আশা যত বিরক্ত হয় সইয়ের ওপর—তত তার ঝোঁক চেপে যায় কি করে একটা বিয়ের যোগাযোগ হতে পারে।

মাসীমা প্রায় হাল ছেড়ে দিলেও একমাত্র তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাজেই যথাসময়ে সে হাজির হল বিদ্যুৎদের বাড়িতে।

অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই। কিন্তু বাড়ির কেউ সেদিকে উঁকি মেরে দেখে না। তারাও সবাই এটাকে একরকম খেলাই মনে করে নিয়েছে।

তরুণ হবু বর কনে দেখে ভারী খুশী। বলল এমনি চৌকস মেয়েই তো আমি চাই। চোখ-ঝলসানো রূপ, চটপটে, ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলতে পারবে, পার্টি, লাঞ্চ, ডিনারে হামেশা যেতে হবে। গভর্ণমেণ্ট হাউসে পার্টি থাকবে, এক্সিবিশন "ওপন" করতে হবে, সব অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়াও তো চাই…।

বিদ্যুৎ ঠোঁট উলটে বলল, কিন্তু আপনি কি রকম বিধান সভায় বক্তৃতা দেন তাও তো আমাদের শোনা দরকার। কি বলিস রে সই?

আশা পাশেই বসে ছিল। বিদ্যুতের মন রাখা গোছ তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে দিল।

বিধান সবার তরুণ সদস্য পুলকিত হয়ে বলল, বেশ তো। এ তো আনন্দের কথা। দুটি "ভিজিটার্স কার্ড" আমি কালকেই আমার পিয়ন দিয়ে পাঠিয়ে

দেব। আপনারা দুই সখিতে মিলে অবশ্য যাবেন। আপনাদের দেখলে—সত্যি বলছি—আমি প্রেরণা পাব। তখন বক্তৃতা ভাজা-খইয়ের মত আমার মুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসতে থাকবে—

বিদ্যুৎ আশার মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হাসল।

যথাসময়ে দুই বান্ধবী গিয়ে উপস্থিত হল বিধান সভায়। গিজ গিজ করছে মানুষ। ভেতরে সরকারী পক্ষ আর বিরোধী দলের দারুণ বাকবিতণ্ডা। সেদিন-কার বিষয় হচ্ছে "পশুপালন"। সেদিন বিরোধী পক্ষের বক্তৃতার তোড়ে বিধান সভায় দাঁড়ায় কার সাধ্যি! আর পশুরা যদি মানুষের কথা বুঝতে পারত তো তারা দল বেঁধে বন-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে সাবাস আর বাহবা দিয়ে উঠত। জয় কামনা করত বাক্যিসর্বস্ব মানুষের। পশুর দুঃখে মানুষ এত দরবিগলিত ধারায় ধারাবাহিক ভাবে কাঁদতে পারে একথা কারো জানা ছিল না! সেই তরুণ বিধান সভার সদস্য তো পশুর দুঃখে ভিজিটার্স গ্যালারীর দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত আর্তনাদ শুরু করে দিলেন। এ আর্তনাদ পশুর দুঃখে না আর কোন অকথিত কারণে তা কেউ বুঝতে পারল না।

বিদ্যুৎ বিরক্ত হয়ে বলল, কি রকম হামলাচ্ছে দেখ না! একেবারে মাথা ধরিয়ে দিলে।

দুজনে উঠে বাইরে বেরুবার জন্যে রওনা হল। ছুটতে ছুটতে এসে তরুণ বক্তৃতাবাগীশ ওদের পথের মাঝখানে ধরে ফেলল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে জিজ্ঞেস করল, কেমন শুনলেন?

বিদ্যুৎ কটাক্ষ করে উত্তর দিল, আজ্ঞে, পশুর দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করুন, অন্য-দিকে মন দেবার বৃথা চেষ্টা করবেন না।

তরুণ বক্তৃতাবাগীশের মুখ থেকে শুধু একটি বিস্ময়কর ধ্বনি বেরিয়ে এলো—অ্যা—।

ইতিমধ্যে আশা আর বিদ্যুৎ দুজনেই কলেজের ছাত্রী হয়ে একই সঙ্গে পড়া-শোনা চালিয়ে যাচ্ছে। বানর নাচের খেল কিছুটা মন্দা দেখা গেলেও ওদের

সখিত্বে কিন্তু এতটুকুও ভাটা পড়ে নি! বিদ্যুতের মা শুধু মাঝে মাঝে আশাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুঃখ করেন, আমাদের অবর্তমানে মেয়েটার যে কি দশা হবে সেই কথা ভেবে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। তখন কি ওর ভায়েরা ওকে দেখবে?

আশা মাসীমাকে সান্ত্বনা দেয়, বিদ্যুতের জন্যে আপনি কিছু ভাবনা করবেন না মাসীমা। একদিন না একদিন ওর সুমতি হবেই। তখন ও ছেলেখেলা ভুলে গিয়ে রাজরাণীর আদরে শ্বশুর ঘর করতে যাবে।

বিদ্যুতের মা উত্তর দেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা। মরবার আগে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

কিন্তু সব চাইতে মজার কথা এই যে, বিদ্যুতের খেলা আর শেষ হয় না। নিত্যি নতুন রূপ নিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করে।

ইতিমধ্যে কলকাতার শহর মেতে উঠল এক "সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়"। যে সেরা সুন্দরী বলে স্বীকৃতা হবে তাকে রাজ্যপাল ভবনে এক বিরাট অভিনন্দন দেওয়া হবে এবং তারপর বেরুবে এক শোভাযাত্রা।

এই প্রতিযোগিতায় "মিস কলকাতা" আখ্যা পেল কুমারী বিদ্যুৎ। তাকে নিয়ে এমন এক মিছিল বের হল যে, ভিড়ের চাপে খুব কম পক্ষে একশত "ব্যাচিলার" মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল।

কাগজের পুরোনো রিপোর্টারেরা এই মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শোকযাত্রাকেও এই মিছিল ম্লান করে দিয়েছে।

দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিকে ছাপা হল নানা রঙের ছবি। সেই আলেখ্য দেখে ছুটে এলেন গিরিডির বিখ্যাত গোলাপ বাগানের মালিক লোহিতসুন্দর!

কনে দেখে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করলেন, এতদিন তাঁর হাজার হাজার একর জমিতে লাল গোলাপ ফুটেছে আর অনাদরে ঝরে পড়েছে। এইবার সেই গোলাপগুচ্ছ সার্থকতা লাভ করবে বিদ্যুতের দুটি আলতা রাঙা চরণতলে।

বিদ্যুৎ কিন্তু এতখানি কবিত্বেও কিছুমাত্র বারি বরিষণ করল না। শুধু ভ্রূভঙ্গে বলল, আপনি তো শুনি লাল গোলাপের চাষ করেন, কিন্তু আপনার গায়ে

গোবরের এত গন্ধ কেন? সার জোগাবার মহান দায়িত্ব কি আপনিই গ্রহণ করেছেন?

লোহিতসুন্দর যেমন হাসিখুশী মুখে এসেছিলেন তেমনি মুখখানি কালো করে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

বিদ্যুতের মা কপালে করাঘাত করে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, আমার অদৃষ্ট!

এরপর যিনি বিদ্যুৎকে দেখতে এলেন তিনি কোন মফঃস্বল কলেজের এক নিরীহ অধ্যাপক। একটা বিষয় লক্ষ্য করবার যে, বিলাত-ফেরত, নামকরা ব্যবসায়ী অর্থবান ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছিল এবং তারই জায়গায় স্থান করে নিয়েছিলেন—নিরীহ গোবেচারী অধ্যাপক।

এদিনও আশা ছিল তার সখীর পাশে। অধ্যাপক খুব কম কথাই মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন। এবং বিদায় নেবার সময় কোন রকম মন্তব্য করতে বিরত থাকলেন। বিদ্যুৎ তাঁর এই স্বল্প ভাষণকে কেন্দ্র করে রসিকতা করবার প্রয়াস পেল—কিন্তু সে রসিকতা জমল না। হাওয়ায় রাখা মুড়ির মত কেমন যেন মিইয়ে গেল।

দুদিন পর বিদ্যুতের বাবা এক চিঠি পেলেন অধ্যাপকের কাছ থেকে। তাতে খুব সংক্ষেপে লেখা আছে, আপনার মেয়ের পাশে সর্বক্ষণ যে স্বল্পবাক্ মেয়েটি ছিল—তার অভিভাবকের আপত্তি না থাকলে আমি তাকে বধূরূপে বরণ করতে পারি!

সেই চিঠি নিয়ে নাচতে নাচতে বিদ্যুৎ প্রথমে সখী আশার কাছে গেল। তার-পর চিঠিখানা আশার মাকে দেখাল।

মেয়ের পক্ষ যেন আকাশের চাঁদ খুঁজে পেল। এ সম্বন্ধ তাদের কাছে আশার অতিরিক্ত। আদুরে মেয়ে বিদ্যুৎ তার বাবাকে বলে ঠিক করল, বিয়ে তাদের বাড়ি হবে। সখীর বিয়ে কি না।

দু'দিনের কথায় বিয়ে হয়ে গেল। সারারাত ধরে বিদ্যুৎ সখীর বরের সঙ্গে রসিকতা করবার আন্তরিক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলে।

শেষ রাত্তিরে ছাদে দাঁড়িয়ে ম্লান চন্দ্রালোকে তার চোখে কি এক ফোঁটা জল চিক চিক করে উঠল?

সে নিজে কিন্তু স্বীকার করে না। বাঁদর নাচের খেলায় কি তার হার হয়েছে ?

না-না, খেলা তার চলবে।

বিয়ের পর আশার অধ্যাপক-স্বামী তাকে নিয়ে মফঃস্বলে এক কলেজে বদলী হয়ে চলে গেলেন।

এর পরের ঘটনা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল।

পর পর বিদ্যুতের মা আর বাবা হৃদরোগে মারা গেলেন।

কিন্তু বিদ্যুতের খেলায় তখনো যবনিকাপাত হয় নি। দার্জিলিং-এর কোন এক কনভেণ্টে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে জীবনে এই প্রথম বিদ্যুৎ কলকাতা ছেড়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে তার দুটি ভাই-ই বিয়ে করেছে। বৌদের সঙ্গে তার আদপেই বনছিল না।

মা-বাবা নেই যে তার সব কিছু আবদারে সম্মতি দিয়ে চলবেন।

আশা অনেক চিঠি লিখেও বিদ্যুতের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারে নি। তার সইয়ের খেলা শেষ হয়েছে কিনা জানবার জন্যে তার ভারী কৌতূহল জাগে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে কোন হদিশ পায় নি।

আশার অধ্যাপক-স্বামী ঠাট্টা করে বলেন, সংবাদপত্রে একটি নিরুদ্দেশের খবর ছাপিয়ে দাও না।

—"আমার সখ হারিয়ে গেছে…যে তার মন খুঁজে পেতে এনে দিতে পারবে—তাকে আমিও হৃদয় সমর্পন করিব"।

আশা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তোমার রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

অধ্যাপক উত্তর করলেন, রোগ তাহলে খুব জটিল!

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর হঠাৎ আশা একখানি চিঠি পেল। হস্তাক্ষরটি তার অত্যন্ত পরিচিত। দুরু দুরু বুকে আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে খামখানি খুলে তার দুটি চোখ মেলে ধরল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পত্র। তাতে লেখা আছে—

আশা,

বানর নাচের খেলের শেষ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে—২৫শে আষাঢ় সন্ধ্যায়।

প্রধান সাথীরূপে তোকে উপস্থিত থাকতে হবে। ঠিকানা ওপরে রইল।

তোর বিদ্যুৎ

চিঠি নিয়ে ছুটতে ছুটতে আশা স্বামীর কাছে উপস্থিত হল। বলল, এক্ষুণি আমাদের রওনা হতে হবে। আর এক মিনিটও দেরি নয়।

চিঠি পড়ে আর সব কিছু অনুমান করে অধ্যাপক বললেন, যাক্, অবশেষে তোমার সখীর মনের-মানুষ পাওয়া গেছে! আমি কিন্তু যেতে পারব না। কাঁধের ওপর এক বোঝা পরীক্ষার খাতা।

আশা রাগ করে বলল, কিন্তু তাই বলে আমি আমার সইয়ের বিয়েতে যাব না? পরীক্ষার খাতাই তোমার বড় হল?

অধ্যাপক উত্তর করলেন, আ হা-হা? সে কথা কি আমি বলেছি? তুমি তোমার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গা বলে রওনা হয়ে পড়। ভগবান তোমার সখীর সুমতি দিন।

আশা হিসাব করে দেখল, সেদিন রাত্তিরে রওনা হলেও বিয়ের সময় গিয়ে দার্জিলিং পৌছুতে পারছে না। পৌছুতে হবে পরদিন সকাল বেলা।

আপন মনেই বলল, তা হোক। তবু তো বাসী বিয়ে রইল। আজ ওর মা নেই, ভায়েরা থেকেও নেই। আমিও যদি পাশে না থাকি তবে কোন্ ভরসায় ও নতুন ঘর বাঁধবে? আনন্দে আর বেদনায় আশার চোখে জল এলো।

সেদিন সকাল বেলা দার্জিলিং পৌছে আশা আর তার দেবর ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এক বাংলোর সামনে এসে উপস্থিত হল।

চুপচাপ নিঝুম বাড়ি।

বিয়ের হৈ-হুল্লোড় চীৎকার, লোকজনের আনাগোনা, বাজি-বাজনা কিছু নেই।

দরজাটা হা-হা করছে খোলা।

আশা ছুটে ভেতরে গেল।

খোলা চুলে, রাঙা চোখে, অগোছাল বেশভূষায় উদাসভাবে বিদ্যুৎ তখনো বাসর-শয্যায় একা বসে।

সামনে পড়ে আছে একটি খোলা চিঠি। আশা তাড়াতাড়ি চিঠিখানি হাতে

তুলে নিলো। ওতে লেখা রয়েছে—

বিদ্যুৎ,

অমরগঞ্জের কুমার বলে তোমার কাছে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম। এটা আমার খেলা। আসলে লক্ষ্য ছিল তোমার দামী গয়নাগুলির দিকে। বাসর-শয্যায় নিশ্চিন্তে তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। তাই আমার খেলা খেলতে কোন অসুবিধে হয় নি। তোমায় ধন্যবাদ।

চললাম। তুমি আবার নতুন করে ছাদনাতলার খেলা খেলতে পার। অনু-মতি দিয়ে গেলাম। After all I am a sportsman. বানর নাচের খেলের একটা জবাব হয়তো পুরুষদের পক্ষ থেকে মিলল। Sweet dreams.

তোমার

অতনু

বালিগঞ্জের সঙ্গে টালিগঞ্জের রেষারেষি!

এরা যেন দুই সতীন!

টালিগঞ্জের বাসিন্দাদের অভিযোগ—কৃষ্টি-কেন্দ্র কেন বালিগঞ্জে হবে? লেকের ওধারটা ভাগ্যিক্রমে পেয়ে গেছে বলেই কি বালিগঞ্জ সব তাতেই বাজিমাৎ করবে? কৃষ্টির চূড়ান্ত উদাহরণ দেখাবার অধিকার ওরাই কি একচেটে করে রাখবে?

কেন, টালিগঞ্জ কি ভেসে এসেছে? ওরাও তো একেবারে ফেলনা নয়। লেক তো ওদেরও গা ঘেঁষে রয়েছে। লেকের হাওয়া তো ওদের পাড়ার ওপর দিয়েও ঝির ঝির করে বয়ে যায়।

তবে টালিগঞ্জ সকল দিক দিয়ে এতটা পেছিয়ে থাকবে কেন?

টালিগঞ্জের চাইতে বালিগঞ্জ কিসে এত বড হল—তারই হিসেব কষতে বসল মিলনেশ্বর মাইতি। ভুষি মাল চালান দিয়ে অবস্থা ফিরিয়েছে। এখন কৃষ্টির দিকে প্রখর দৃষ্টিপাত করেছে। অনেকখানি জমি নিয়ে টালিগঞ্জ অঞ্চলে হাল ফ্যাসানের বাড়ি তৈরী করেছে।

তারই আক্রোশ সব চাইতে বেশী।

কাজেই মিলনেশ্বর মাইতি খাতা-পেন্সিল নিয়ে হিসেব করতে বসে গেল। চুলে আর গোঁফে মিলনেশ্বর নিজেকে অনন্যসাধারণ করে রেখেছে—যাতে সকলের দৃষ্টি পড়ে!

বালিগঞ্জের প্রত্যেক বাড়ি থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নাকিস্বরে আধুনিক গান ভেসে আসে। টালিগঞ্জে ওটার আশু চালু করা প্রয়োজন। দোলের সময় বালিগঞ্জের ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে আবির ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ অঞ্চলে সেটার ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক বাড়িতে ওরা সঙ্গীতের জলসা করে। এটার আয়োজন করা খুব বেশী শক্ত নয়। মাঝে মাঝে ওরা নাকি পরিচিত অঞ্চলে

উদ্যান-সম্মেলনের আয়োজন করে। তাতে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা থাকে। টালিগঞ্জে এই প্রথার প্রবর্তন করতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু তবু হাল ছেড়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

এই ভাবে নানা রকমে হিসেব করতে থাকে—অতি উদ্যমী মিলনেশ্বর মাইতি।

মিলনেশ্বরের বন্ধুর নাম রত্নাকর রায়। নামেও রত্নাকর—কাজেও রত্নাকর। সে মিলনেশ্বরের সব প্ল্যান শুনে বললে, ওভাবে চললে সারা জীবন কেটে যাবে। তার চাইতে একটি "কৃষ্টিকেন্দ্র" খোলা যাক। সেইখানেই সকল রকম "কালচার" শেখানো যেতে পারবে।

মিলনেশ্বরের ভ্রূটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত বেঁকে উঠল। জিজ্ঞেস করলে, "কৃষ্টিকেন্দ্র"? সেটা আবার কি ব্যাপার?

রত্নাকর উত্তর দিলে, ও। বাংলা করে বললে বুঝি তুমি বুঝতে পারবে না? সোজা কথায় "কালচার সেণ্টার।"

এইবার বোধকরি বিষয়টা মিলনেশ্বরের মগজে প্রবেশ করল। সে চেয়ারে বসে ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল।

তখন "কৃষ্টিকেন্দ্রের" সব পরিকল্পনা দুই বন্ধুতে ছকে ফেললে।

মিলনেশ্বর জিজ্ঞেস করলে, আইডিয়াটি তো মন্দ করা গেল না! এখন প্রতিষ্ঠানটি খোলা হবে কোথায়? লেকের ধারে?

রত্নাকর উত্তর দিলে, না রে—লেকের ধারে কেন? তা হলে তো বালিগঞ্জের নকল করা হবে। তোর বাড়ির একতলার ঘরগুলি তো খালিই পড়ে আছে। ওখানে দিব্যি "কৃষ্টিকেন্দ্র" খোলা যেতে পারে। যা কিছু নতুন আইডিয়া সব এখান থেকেই রূপ লাভ করবে। তোর বাড়িটি হবে টালিগঞ্জের তীর্থকেন্দ্র।

বন্ধুর কথা শুনে মিলনেশ্বর মনে মনে রোমাঞ্চ অনুভব করলে। তারপর মিস্ত্রীকে খবর দিলে। ঘরগুলি নতুন ডিজাইনে রঙ করতে হবে। একটি নটরাজের মূর্তি বসবে—দেয়ালের ধার ঘেঁষে। কোণে-কোণে পদ্মের আলপনা। ঘরে যে ফ্যানগুলি চলবে—তার ব্লেডগুলিও হবে পদ্মের আকারে। সব কিছুই যাতে "কৃষ্টিকেন্দ্র" নামের সঙ্গতি রক্ষা করে চলে—সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দিতে হবে।

ভেতরের সব কাজ যখন সমাধা হয়ে গেল—তখন বাইরে ফটকের কাছে শ্বেত-পাথরের ফলক পড়ল "কুষ্টিকেন্দ্র"।

কুষ্টিকেন্দ্রের লনের বাগানটা সাজানোর কথা ভুললেও চলবে না। নানা রকম সিজন ফ্লাওয়ার এমন ভাবে বসাতে হবে—যাতে নামকরা সিনেমা তারকাদের মুখের আদল আসে।' আগেকার দিনে ঘুম থেকে উঠে অহল্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতি পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করতে হত। আজকের যুগে সিনেমা তারকাদের নাম জপ করলে দিন ভালো যায়।

তাছাড়া "কুষ্টিকেন্দ্রের" অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই হচ্ছেন—চোখ-ঝলসানো তারকার দল। তাদের ভুলে থাকা তো কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না!

কাজেই রচিত হল সুন্দর উদ্যান।

এই উদ্যান দেখে কে না বলবে—"আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

এরপর রত্নাকর রায়ের পরামর্শে রচিত হল একটি আবেদন পত্র—

টালিগঞ্জবাসীদের প্রতি করুণ আবেদন,

অঞ্চলবাসী ও বাসিনীগণ,

টালিগঞ্জের নামে আজকাল অনেকেই নাসিকা কুঞ্চন করে। কিন্তু কুষ্টির ক্ষেত্রে টালিগঞ্জ কেন বালিগঞ্জ থেকে পিছিয়ে থাকবে? বালিগঞ্জের অন্ধ অনুকরণ করে আমরা এই অঞ্চলে কুষ্টি বিতরণের তপস্যা শুরু করে দিয়েছি। সেই মহান উদ্দেশ্যেই "কুষ্টিকেন্দ্র" গঠিত হয়েছে।

কে আছেন তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা—সবাইকে আমরা সমভাবে কুষ্টি-ধর্মী করে তুলব। কোন বয়সই কুষ্টি-লাভের পক্ষে অধিক নয়। আসুন, জীবনকে কুষ্টিমণ্ডিত করে শতদলের মত বিকশিত করে তুলুন!

মিলনেশ্বর মাইতি

সর্বাধিনায়ক

"কুষ্টিকেন্দ্র"

এই করুণ আবেদন সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হল। গৃহিণীরা অন্দরমহলে রান্না করছেন—সেখানে গিয়ে উড়ে পড়ল এই আবেদন। ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়

থেকে ফিরে আসছে—তাদের হাতে গুঁজে দেওয়া হল এই আবেদন। তরুণেরা ফুটবলের মাঠ থেকে হৈ-হুল্লোড় করে ফিরে আসছে—তাদের সবাইকার হাতে তুলে দেওয়া হল করুণ আবেদন। পাড়ায় নতুন বৌ আসছে—তার হাতে দেওয়া হল এই করুণ আবেদন! শুধু কি তাই? মাসিপিসি খুড়ী-জেঠির দল কালীঘাট যাচ্ছেন কিংবা গঙ্গাস্নানে চলেছেন—তাদের গঙ্গাজলের ঘটির ভেতর কিম্বা গামছার পুঁটলিতে কৌশলে করুণ আবেদন গচ্ছিত রাখা হল! পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত আর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা মাঠে ও পার্কে ছাতা মাথায় বসে সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন, তাঁদেরও কোলে এসে পড়ল এই করুণ আবেদন!

এই ভাবে কৃষ্টিকেন্দ্রের করুণ আবেদনে টালিগঞ্জের আকাশ-বাতাস অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তার ফল ফলতে বিশেষ বিলম্ব হল না।

দলে দলে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীরা এই নবগঠিত "কৃষ্টিকেন্দ্রে" এসে ভর্তি হতে লাগল।

সেদিন সকালবেলা মিলনেশ্বর মাইতি আর রত্নাকর রায় বসে "কৃষ্টিকেন্দ্রের" নব নব পরিকল্পনার কথা আলোচনা করছে—এমন সময় মধ্য-বয়েসী এক ভদ্রলোক গাড়ি থামিয়ে একেবারে ওদের দুজনের সামনে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল।

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, ওরা দুজনে কোন কার্য-কারণ ঠাহর করতে পারলে না!

মিলনেশ্বর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা ভাই রত্নাকর, লোকটার মৃগীর ব্যামো নেই তো?

রত্নাকর নীচের ঠোঁটটা বেঁকিয়ে অবজ্ঞার স্বরে বললে, কি জানি! কিন্তু আমাদের এখানে আসা কেন? আমরা তো আর চিকিৎসক নই!

মিলনেশ্বর মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, ঠিক কথা!

কিন্তু লোকটা ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। হঠাৎ চোখ দুটো কপালের দিকে মেলে ধরে বললে, একটু জল।

জল এলো। লোকটি সেই ঠাণ্ডা জল পান করে শান্ত হয়ে উঠে বসল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে শুধোলে, আচ্ছা, আমি কৃষ্টিকেন্দ্রে এসে পৌঁছেছি তো?

এইবার মিলনেশ্বর বোধকরি কথা শুরু করবার একটা সুতো খুঁজে পেলে। আগ্রহের সঙ্গে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনি বুঝি আপনার মেয়েকে কৃষ্টিকেন্দ্রে ভর্তি করে দিতে চান?

রত্নাকর বাকি বক্তব্যটা লুফে নিয়ে মন্তব্য করলে, আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আমরা আপনার মেয়েকে সকল রকমে আধুনিকা করে তৈরী করে দেব।

লোকটি একটা উদ্গার তুলে উত্তর দিলে, আজ্ঞে আমার তো মেয়ে নেই। ভর্তি হতে চাই আমি। আমার নাম মোহমুদ্গার কুঠারী।

এইবার দুই বন্ধুর হেঁচকি তোলার পালা। দুই জনেই অনেকক্ষণ এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক ভাবে বসে রইল।

তারপর রত্নাকর জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা মোহমুদ্গারবাবু, আপনি এই বয়সে কৃষ্টিকেন্দ্রে ভর্তি হবেন—ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো!

মোহমুদ্গার কুঠারী একটা গগনভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিলেন, গোলমরিচই আমার কাল হল!

উত্তর শুনে দুই বন্ধু একেবারে অগাধ জলে পড়ে গেল! কৃষ্টিকেন্দ্রের সঙ্গে গোলমরিচের কি সম্পর্ক?

দুজনের মুখ দিয়ে এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল, গোলমরিচ?—অ্যাঁ! গোলমরিচ দিয়ে কি হবে? আপনি খুব গোলমরিচ খেতে ভালবাসেন বুঝি?

মোহমুদ্গার কুঠারী একটু নড়েচড়ে বসলেন। দুই বন্ধুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, আমার দুঃখের কাহিনী আপনাদের তাহলে খুলেই বলি: সারা জীবন শুধু গোলমরিচ চালান দিয়েছি। তাই ছিল আমার ধ্যান, জ্ঞান, আরাধনা। সংসার বাঁধবার বা বিয়ে করবার সময় ছিল না। যখন ব্যবসাতে অনেক টাকা জমে গেল—তখন হঠাৎ মনে পড়ল—বয়েস অনেক হয়ে গিয়েছে, এখন বিয়ে না করলে জীবনে হয়তো আর সুযোগই পাওয়া যাবে না।

বাংলা দেশে সব কিছুতেই ভেজাল আছে। কিন্তু ভালো কনে খুঁজলে আপনি ভেজালশূন্যভাবেই পাবেন। আমিও একটু চেষ্টাতেই পেয়ে গেলাম। মেয়েটি

পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে। এইখানে নিজের চেষ্টায় বি-এ পাশ করেছে। সেতার, এস্রাজ বাজাতে পারে, ভালো নাচগান জানে। অনেক গুণ তার। তাকে পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে! কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি মশাই, সে গোলমরিচের গন্ধ সইতে পারে না। অথচ মজা দেখুন, গোলমরিচই আমার প্রাণ। সমস্ত দিন গোলমরিচের মধ্যেই কাটে। সারা দেহে আমার গোলমরিচের গন্ধ।

সুনীতা বলে, তুমি সরে বসো আমার কাছ থেকে। গোলমরিচের গন্ধ আমি আদৌ সইতে পারি না! তারপর একদিন সে হঠাৎ বলে বসল, এতটুকু 'কালটুর' নেই তোমার বাড়িতে।

আমি ভাবলাম, 'কালটুর' বুঝি আমচুরের মত মেয়েদের কোন মুখরোচক খাদ্য। তাই সারাটি দিন হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে বড়বাজার ঝেঁটিয়ে নানা জাতের আমচুর জোগাড় করে নিলাম। যেটা ওর পছন্দ হয় নিজে হাতে তুলে নেবে।

—তারপর?

তারপর আর কি! পা দিয়ে সব ছড়িয়ে ফেলে দিলে। বললে, এই তোমার বাড়ির 'কালটুর'। টাকা থাকলেই সেটা পাওয়া যায় না জেনো!

আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। অনেক খোঁজা-পাতি, জিজ্ঞেসবাদ আর ছুটোছুটির পর—আমার এক বন্ধু বলে দিলে, এই কৃষ্টিকেন্দ্রে এলে কালটুরের হদিশ মিলবে। তাই তো ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে এলাম সেই কালটুরের সন্ধানে।

মোহমুদ্গার কুঠারী কোঁচার খুঁট দিয়ে নিজের কপালের ঘাম মুছে ফেললে।

নতুন করে মিলনেশ্বর মাইতি আর রত্নাকর রায় উৎসাহিত হয়ে উঠল।

বললে, ঠিক আছে। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। আমরা আপনাকে ছ মাসের মধ্যে এমন 'কালটুরে' অভিষিক্ত করে তুলব যে, আপনার নব-পরিণীতা সুনীতা আপনার কাছ থেকে কালটুরের নব পাঠ নিতে এগিয়ে আসবেন।

এই ঘটনার মাসখানেক বাদে একটি পুরোনো ধরণের গাড়ি এসে থামল—"কৃষ্টিকেন্দ্রের" দরজার সামনে।

এক বৃদ্ধ একটি সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে কৃষ্টিকেন্দ্রের অফিসঘরে এসে ঢুকলেন। মেয়েটি স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে একেবারে অতুলনীয়া। দেখলে চোখ ফেরানো মুস্কিল। সদ্য-বিবাহিতা বলেই মনে হয় মেয়েটিকে। মাথার ওপর ঘোমটা টানা।

মিলনেশ্বর বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মেয়েকে ভর্তি করবেন বুঝি?

বৃদ্ধ চাদর তুলিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। রত্নাকর বললে, এই যে, এই ফ্যানের তলায় এসে বসুন। গায়ের ঘাম এক্ষুনি মরে যাবে।

বৃদ্ধ আরাম করে চেয়ারে বসে বললেন, আর কপালের গেরোর কথা বল কেন? ও আমার মেয়ে নয়—ভাগনী। আমরা পল্লী অঞ্চলের মানুষ। ভগবানের আশীর্বাদে অবস্থা আমার ভালই। এই ভাগনীকে আমিই মানুষ করেছি বাবা। গিন্নীর সখ হল—কলকাতা শহরের জামাই করবেন। জামাইয়ের বাড়ি গাড়ি থাকবে। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে কালীঘাট দর্শন আর গঙ্গা স্নান—এই বোধকরি মনোবাসনা ছিল।

মিলনেশ্বর জিজ্ঞেস করলে, তা মনোমত জামাই বুঝি মেলে নি?

বৃদ্ধ আবার মাথা নাড়তে লাগলেন।

বললেন, না বাবা, সে কথা বলব না। ভগবানের দয়ায় যেমনটি চেয়েছিলাম—ঠিক তেমনটি পেয়েছি। সুদর্শন জামাই, ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। আমার ভাগনীকে নিজে দেখে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিল।

—তারপর?

—তারপর গোলমাল লাগল বিয়ের পর থেকেই।

—কেন? গোলমাল আবার কিসের? এমন লক্ষ্মী প্রতিমা বৌ। ছেলের অবস্থা ভালো। নিজে ইঞ্জিনিয়ার। অশান্তি তো হবার কথা নয়! ও দজ্জাল শাশুড়ী রয়েছে বুঝি সংসারে?

—না বাবা, সে সব কিছু ঝামেলা নেই। আসলে আমাদের জামাই বাবাজীর পছন্দ হচ্ছে না আমার ভাগ্নীকে।

—কেন? কেন? এমন স্বাস্থ্য, এমন মুখশ্রী শহরেই বা ক'টি মেয়ে মিলবে!

—বল তো বাবা! বল তো সে কথা। আমরাও তো সেই কথাই বলি।

—তবে ?

—তবে আমাদের জামাই বলে অন্য কথা।

—কি রকম ?

—বিয়ের পরেই সিঁথের সিঁদুর মুছে দিয়েছে। বলে, আমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে হবে। ওসব সেকেলে-পনা চলবে না। মেয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর কাছে প্রদীপ দেয়। জামাই সে সব ভেঙে ফেলেছে। বলছে কুসংস্কার। ওকে আবার ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে। কিন্তু বাবা, শাড়ি কি করে পরতে হয়, নখ কি করে রাঙাতে হয়, মুখে কি করে চুনকাম করতে হয়—এ সব তো আমরা পাড়া-গাঁয়ে শেখাই নি। তাই জামাই রাগে গর্‌গর্‌ করে। বলে, মাকাল ফলের মত শুধু রূপ থাকলে কি হবে? কালচার দিয়ে তার দীপ্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমরা কর্তা-গিন্নী ভেবে ভেবে মরি। মেয়েটার এমনি যা দীপ্তি আছে তাই সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে! আবার ওর আলাদা দীপ্তি কি করে ফোটাব ?

আমাদের পাড়ার এক বখা ছোঁড়া চুল উল্টে ঘুরে বেড়ায়। সে সব কিছু শুনে বললে, আপনাদের মেয়েকে "কৃষ্টিকেন্দ্রে" ভর্তি করে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো আকাশ-পাতাল ভেবে মরি—কোথায় কৃষ্টিকেন্দ্র। তখন ছেলেটি ঠিকানা দিতে ভাগনীকে নিয়ে সোজা এইখানে চলে এসেছি। তোমরা আমার ছেলের মত। ভাগনীটিকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দাও, যাতে আমাদের জামায়ের মনে ধরে।

সব শুনে মিলনেশ্বর হাসবে কি কাঁদবে— ঠিক বুঝতে পারে না। ওদের যে এত গুণ—সে কথা এর আগে জানা ছিল না! সত্যিই কি কৃষ্টিকেন্দ্র খুলে ওদের 'বিভূতি' লাভ হয়েছে ?

যাই হোক, বাইরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করা হবে না। সিদ্ধিলাভ করা সন্ন্যাসীর মত ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে মিলনেশ্বর সান্ত্বনা দিয়ে বললে, আপনি কোন কিছু ভাববেন না। আপনার ভাগনীকে আমরা একেবারে জামায়ের মনোমত

করে গড়ে দেব। তখন সে কেবলি বৌয়ের পায়ে পায়ে ঘুরবে—আর মন জুগিয়ে চলবে।

বৃদ্ধের মন থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল। ডান হাতটা তুলে বললেন, তাই কর বাবা, তাই কর। ওর দীপ্তি ফুটে বেরুলেই জামায়ের হাতে ওকে তুলে দিয়ে আমরা বুড়ো-বুড়ী একেবারে কাশীবাসী হব—ঠিক করে ফেলেছি। সংসারের ভেজালে আর নয়।

পল্লী অঞ্চলের সুন্দরী মেয়ে কৃষ্টিকেন্দ্রে ভর্তি হল—দীপ্তি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে।

আরো কয়েক দিন পরের কথা।

একটি কলেজের ছেলে, একটি কলেজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে কৃষ্টিকেন্দ্রে এসে হাজির হল। প্রথমে ছেলেটি একটু ইতস্তত করছিল।

কিন্তু মেয়েটি এগিয়ে এলো একেবারে সপ্রতিভের মত।

মিলনেশ্বর জিজ্ঞেস করলে, তোমরা ভর্তি হবে বুঝি?

মেয়েটি উত্তর দিলে, হ্যাঁ ভর্তি হব। কিন্তু আমাদের একটু আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।

—কি রকম?

—মানে—আমরা কলেজ থেকে সোজা এখানে চলে আসব কিনা। আমাদের কৃষ্টি সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনার আছে। তাই দুপুরবেলাটা নিরিবিলি আলোচনার জন্যে একান্তে একটি ছোট্ট কামরা চাই। অবশ্য টিউশন ফী ছাড়াও আমরা এক্সট্রা পে করব।

মিলনেশ্বরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলে, কৃষ্টি বিতরণের জন্যে আমরা সব রকম আয়োজনই করে দেব। তোমাদের ভাবনার কোন কারণ নেই।

এই কলেজের ছেলেটি আর মেয়েটি 'কৃষ্টিকেন্দ্রের' প্রায় প্রচার সচিবের কাজ করলে। ওদের কাছ থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের হদিশ পেয়ে বিভিন্ন কলেজের

ছেলে-মেয়েরা দলে দলে এসে ভর্তি হতে লাগল।

কুষ্টিকেন্দ্রের একেবারে বাড়-বাড়ন্ত হতে থাকল। রত্নাকর বুদ্ধি করে একটি কফি হাউস এবং টিফিনের জন্যে একটি ক্যান্টিন খুলে দিলে। তাতেও লাভ হতে লাগল প্রচুর।

সারা শহরে এই ভাবে কুষ্টিকেন্দ্র সাড়া জাগিয়ে তুলল।

কিন্তু আরো বিস্ময় জমা হয়েছিল—টালিগঞ্জের অধিবাসীদের জন্যে।

কিছুদিন বাদে পাড়ার লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে—"কুষ্টিকেন্দ্রের" নেম-প্লেট সরে গেছে—আর সেই জায়গায় জ্বলজ্বল্ অক্ষরে নিয়নলাইট জ্বলছে। জ্বলছে আর নিভছে—

"বৈজ্ঞানিক মিলন-কেন্দ্র"

আধুনিক তরুণ-তরুণীদের রাজযোটক বিচার

করা হয়।

শোনা গেল, অতি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠানের বিশাল অট্টালিকা লেকের ধারে তৈরী হবে। তাতে যদি বালিগঞ্জ আর টালিগঞ্জের চিরকেলে ঝগড়া মিটে যায়।

-- ইতি --

স্বপনবুড়োর রকমারী বই।

উপন্যাস ঃ

বেপরোয়া, বন পলাশীর ক্ষুদে ডাকাত, বাস্তুহারা, পঙ্ক থেকে পদ্ম জাগে, ধন্যি ছেলে, শশী শ্যামলের সাঁকো, উড়ন্ত চাকি, প্রেতপুরী, নরহরি পণ্ডিতের কাহিনী (যন্ত্রস্থ)

গল্প ঃ

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বপনবুড়োর গল্প সঞ্চয়ন, স্বপনবুড়োর হাসির গল্প, স্বপনবুড়োর মজার গল্প, স্বপনবুড়োর রকমারী গল্প, স্বপনবুড়োর স্বনির্বাচিত গল্প, স্বপনবুড়োর পাঁচমিশেলী গল্প, পরীর গল্প (স্বপনবুড়োর গল্পমালা সিরিজ), স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী

নাটক ঃ

বাণী, কমলা, এশিয়ার নৃত্যছন্দ, স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য (তিন ভাগ), আত্মহত্যা, প্রতিশোধ, মায়াপুরী, তালবেতাল, প্রথম পুরস্কার, বাপ্পাদিত্য মহাপূজা, শর্মিষ্ঠা-দেবযানী

ভ্রমণ কাহিনী ঃ

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে, দেশে দেশে মোর ঘর আছে, স্বপনবুড়োর সফর

হাসির কবিতা ঃ

স্বপনবুড়োর হুল্লোড়

হাসির গল্প ঃ (সাবালকদের জন্য)

এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা, বহুরূপী, গভীর গাড্ডা

সঙ্কলন ঃ

স্বপনবুড়োর ঝুলি, পালা-পার্বণ, ছড়া-ছন্দ

ছড়া ঃ

স্বপনবুড়োর ছড়া

জীবনী ঃ

স্বপনবুড়োর শৈশব

খুব ছোটদের ঃ

পড়াশোনা